কাপুরুষ

–পলাশ চক্রবর্তী

বারো বছর বয়সের কথা। এ সময় নারীদের সম্পর্কে আমার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল হলো। বিস্তর গবেষণার পর অনুভব হলো নারীর মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য ও গাঢ় সুখ আছে। ঠিক সেই থেকে মেয়েদের দল ছেড়ে ছেলেদের দলে খেলতে লাগলাম। আমার ভেতর জন্ম নিল লজ্জা। সেই বয়সে আমার জীবনে একটি *দুর্ঘটনা* ঘটলো। আত্মীয়ের বাড়ি দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছি। সারা দিন হই চই করলাম। রাতে শোয়ার জায়গার সংকট দেখা দিল। অগত্যা দুই অপরিচিত মেয়ের বিছানায় ঠাঁই হলো। তাদের বয়স আমার চেয়ে এক দুই বছর কম হবে। মাঝখানে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লাম। তারা আমার গলার ওপর চার পা তুলে ঘুমিয়েছিল। দুইজন দুই হাতে অল্প উন্নত বুকের সঙ্গে জাপটে ধরেছিল। আমি কিছু বলিনি।

পরদিন বিকেল। বারান্দায় বসে পূর্ব রাতের স্মৃতি রোমন্থন করছি। এমন সময় মেয়ে দুটো এসে বললো, *বিলমধু* খাবে?

বিস্ময়ে বললাম, বিলমধু কি?

একজন মাথায় হাত দিয়ে বললো, ওমা, বিলমধু চেনে না! ধান গাছের নিচে মাটির তলে হয়। খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

মনে মনে ভাবলাম, হতেও পারে। ওদের পিছু পিছু চললাম। দুজনের মধ্যে একজন খুব সুন্দরী আর দুষ্টু ছিল। সে আগে হাটছিল। দুই ধারে ধান ক্ষেত বাতাসে নুয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল আমি এক প্রতাপশালী রাজা। দুষ্টু মেয়েটি আমার রানী আর সবুজ ধান ক্ষেত যেন স্যালিউটরত সৈন্য দল।

সুন্দরী মেয়েটি ধান ক্ষেতে নেমে একটি ধান গাছ উপড়ে ফেললো। নিচে সরু গর্ত দেখতে পেলাম। ধান গাছের ডগা কেটে পাইপ বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললো, গর্তে মধু আছে খাও। পরম বিশ্বাসে খেতে লাগলাম। ঝাঝালো আর বোটকা গন্ধ বের হচ্ছিল। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, ওটা ছিল প্রস্রাব। পলিব্যাগে ভরে মাটির নিচে রেখেছিল।

বন্ধুরা শুনে বললো, তুই একটা গবেট।

এরপর বহুদিন তার সঙ্গে দেখা হলো না। স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠলাম। কতো সুন্দরী মেয়ে হেলে দুলে হাটতো। আমার ভেতরের পৌরুষ অনাসক্ত ছিল না। কিন্তু তাদের কাউকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করতো না। মেয়েদের প্রস্রাবে কোনো তীব্র মাদক আছে কি না বলতে পারবো না। তবে এটা ঠিক, বিলমধু পানের পর মাঝে মধ্যে তার কথা খুব মনে পড়তো। তখন উদাস হয়ে যেতাম।

বাইশ বছর বয়সে আবার তার সঙ্গে দেখা হলো। মেয়েটির নাম তিথি। তরুণীটি ততোদিনে বর্ষার ভরা নদীর মতো পূর্ণ যৌবনা। সারা দেহে অদ্ভুত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। কথা হলো আমাদের। ধীরে ধীরে জন্ম নিল ভালোবাসা।

আমাদের মধ্যে অনেক বাধা ছিল। আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ, তিথি শূদ্র। সে ধনীর দুলালি, আমি মধ্যবিত্ত। তবুও মৃত্যুর মতো গাঢ় ছিল আমাদের ভালোবাসা। সুখ ছিল যষ্টিমধুর মতো তীব্র। হঠাৎ একদিন জানাজানি হয়ে গেল সব। আমাদের জীবনে ঝড় উঠলো। তবু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলাম না। আমি নিশ্চিত ছিলাম, তিথিকে না পেলে আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকবে না। আমরা লুকিয়ে দেখা করলাম।

মেয়েটি পায়ে ধরে বললো, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও?

বললাম, না।

সে আকুল আর্তি জানালো, তুমি আমায় বিয়ে করো।

তিথিকে নিজের হাতে ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে ছুড়ে ফেলতে পারতাম। হত্যা করতে পারতাম। তবু অন্য কেউ স্পর্শ করুক এ কথা ভাবতে পারতাম না। সংশয় ছিল গরিবের ঘরে কষ্ট হবে না তো? সে ছোট,

আমি বড়। আমারই বেশি ত্যাগ স্বীকার করার কথা। দায়িত্ব মনে করে বোঝালাম। বললাম, তুমি ফিরে যাও। আমি চিরকাল ভালোবাসবো।

সে শুনলো না। অন্ধের যষ্টির মতো আকড়ে ধরলো।

তার কথা মতো লুকিয়ে বিয়ে করলাম। বললাম, চল পালিয়ে যাই। আমরা মরবো না।

তিথি জানালার ফাক দিয়ে দূর দিগন্তে তাকিয়ে বললো, পরে।

আমরা আইনত স্বামী-স্ত্রী। অথচ দেখা হতো খুব কম। তার জন্মদিনে আতশবাজি পোড়াতাম। ভিখারিদের খাওয়াতাম। অথচ আমার জন্মদিনের খবর আমি কখনো রাখিনি। একটু দেখার জন্য পাগল হয়ে থাকতাম। পড়ার ফাকে চিংড়ি ঘের করলাম। বিকেল চারটায় দুরবিনটা নিয়ে বসে থাকতাম ঘেরের সামনে। সে কখনো সাড়ে চারটায়, কখনো পাচটায় বাড়ির পেছনে আসতো। এক কিলোমিটার দূর থেকে হঠাৎ যখন গাছের ভিড়ে দেখতাম, আমার শিরায় শিরায় রক্ত দ্রুতগতি পেতো। কখনো তার মাকে দেখে স্বর্গ সুখ পেতাম। হাত উচু করতাম। পরে যখন বুঝতাম ওটা ছিল আমার শাশুড়ি, তখন রাজ্যের অবসাদ এসে মনে জমতো। এসব দেখে বন্ধুরা বলতো, ভুলে যা ওসব। লেখাপড়ায় মন দে। নিজের জীবনের সর্বনাশ করিসনে। ওরা বড়লোক। একদিন ঠিকই চলে যাবে। বিশ্বাস করতাম না। তার অশ্রুপূর্ণ চোখের দিকে তাকালে, পৃথিবীর সব বিশ্বাস আমার মনে এসে জমতো।

একবার অনেক দিন দেখা হলো না। আমরা দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। হঠাৎ চিঠি দিল, দেখা করো।

তখন বর্ষাকাল। দুদিন আকাশে সূর্য ওঠেনি। দিন-রাত মেঘের গর্জন আর বৃষ্টি পতনের শব্দে পৃথিবী হয়ে উঠেছিল রহস্যপুরী। বুকের ভেতর যক্ষের বিরহ অনুভব করলাম। ঠিক রাত বারোটায় নারকেল গাছ বেয়ে তিন তলায় উঠলাম। বুকের মাংস ছিড়ে যাচ্ছিল। আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি। অনেক কথা হলো, স্বপ্নের-দুঃস্বপ্নের, জীবনের-মরণের।

আগেই বলেছি, নপুংসক আমি নই। তার ওপর বঞ্চিত স্বামী। শ্রেষ্ঠ স্বাদটুকু পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। সে খুব কাদলো। বললো, *একটি ছাড়া সব নাও।*

বললাম, কেন। বললো, ওটা পরে নিও।

আমার ভেতর আগুন জ্বলছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল টর্নেডো হয়ে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিই ওর নারীত্বকে। কিংবা খুন করি। নিজেকে সংযত করলাম। তার দান নিয়ে সন্তুষ্ট হলাম। পরে অবশ্য চিঠিতে লিখেছিল, স্বামী, তুমি একটা কাপুরুষ।

এরপর ঘন ঘন পাত্রপক্ষ বৌটাকে দেখতে আসতো।

প্রতিবাদ করতাম।

সে বললো, তুমি ইনডিয়া যাও। কাজের সন্ধান করো। আমি মামার বাড়ি সামনের মাসে আসবো। লুকিয়ে কলকাতা কালীঘাটে বিয়ে করবো। তারপর আমরা...।

পিতা মাতার একমাত্র সন্তান আমি। বাড়ি ছাড়লাম, ঘর ছাড়লাম, কলেজ ছাড়লাম। শিয়ালদহ কোলে মার্কেটে কুলিদের সঙ্গে জীর্ণ পোশাক পরে মাল টানতাম। গোবরডাঙ্গায় কাচামালের দোকান দিলাম। অযোধ্যায় ডাক্তারি শিখলাম। মধ্য প্রদেশে তেন্দু পাতা তুলতাম। তা দিয়ে বিড়ি বাধতাম। প্রমাণ করলাম, আমি সব পারি। উচু পাহাড়ে চড়ে দেখতাম, প্রিয়া কতো দূরে। মা কতো দূরে, সোনার বাংলা কতো দূরে। কিন্তু সে জানতো না।

মায়ের শরীর খারাপ শুনে ফিরে এলাম। গভীর আশা নিয়ে দেখা করলাম প্রিয়ার সঙ্গে। বললো, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তুমি আমাকে নিয়ে চলো। বললাম, দশ মিনিট হাটলেই বাস পাবো। চলো, এখনই যাই।

তিথি বললো, আজ না। তিন দিন পরে।

জানতাম, দুদিন পর তার বিয়ে। তবু প্রকাশ করলাম না।

আবারও কাদলো। বললো, যদি অন্য ঘরে যাই, ক্ষমা করে দিও।
একটু হাসলাম। বললাম, শুধু একটা সত্যি জবাব দাও।
কি?
তুমি আমার সঙ্গে পালালে না কেন?
সে মাথা নিচু করে বলেছিল, তুমি যে ভালো আয় করো না, তাই।
বললাম, একটা সিগারেট কিনে দেবে?
সে কিনে দিল।
জীবনে প্রথম তার সামনে সিগারেট ধরালাম। গন্তব্যহীন হাটতে শুরু করলাম।
বন্ধুরা শুনে বললো, ওর মুখে জুতো মারতে পারলি না?
বললাম, না। কারণ সে আমার অনন্ত প্রেম। সে আমার বৌ। নাতিদীর্ঘ জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা।
বন্ধুরা বললো, ভীরু কাপুরুষ।

তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ থেকে

বড় ও ছোট

–সাইফ বিন আইয়ুব

০১৭৭...। সংগ্রহ এবং নাম্বার টেপা।
পরে মেয়েলি কণ্ঠের হ্যালো, কে বলছেন?
আমি সাইফ, ঢাকা থেকে, আপনি?
আমি নাদিয়া ইসলাম। কি জন্য ফোন করেছেন?
আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই। সরল স্বীকারোক্তি আমার।
দেখুন, বোঝানোর ভঙ্গিতে বললো সে, আমার সামনে বিএসসি পরীক্ষা। রাত জাগলে পরীক্ষা খারাপ হবে। এরপরও কথা বলতে চান?
লাইনটা না কেটে সরাসরি এভাবে প্রশ্ন করায় প্রভাবিত হলাম। মানবতা নামের একটি কাটা খোচা দিল মনের ভেতর। অপরাধ বোধে মনটা বিষিয়ে উঠলো। এমনিতেই রাত বারোটার পর কাউকে ঘুম থেকে ডেকে কথা বলার মধ্যে কোনো থৃল থাকে না। তার ওপর সামনে পরীক্ষা। বিদায় নিয়ে লাইনটা কেটে দিলাম। তৃপ্তি বোধ করলাম এই ভেবে যে, সে হয়তো আমার অপরাধ বোধটা বুঝতে পেরেছে।
এক সপ্তাহ পর। অনেকের ভিড়ে ততোদিনে নাদিয়ার কথা ভুলেই গিয়েছি। কারণ প্রতিদিন কথা বলার জন্য একেকজনের কাছে ফোন করতাম। প্রায়ই দ্বিতীয়বার কারো কাছে ফোন করা হতো না।
বন্ধুর ফোন এলো। যে কিনা আমাকে নাদিয়ার ফোন নাম্বারটা দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলো, ফোন করেছিলাম কি না।
সব খুলে বললাম।
বন্ধু আমার হাসতে হাসতে যা বললো, তার মর্ম হচ্ছে, আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। নাদিয়া নাকি ক্লাস টেনে পড়ে। যেদিন ঘুমাবে বলে ফোন রেখে দিয়েছিল সেদিন নাকি তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছে।
নিজেকে সত্যি বোকা মনে হলো। পরদিনই আবার ফোন করলাম তার কাছে। মনে ছিল রাগ, ক্ষোভ আর প্রচণ্ড অপমান বোধ।
এবার কথা বললো সে। পয়তাল্লিশ মিনিট বাইশ সেকেন্ড কথা বললাম। চললো নরমভাবে কথা কাটাকাটি। মিথ্যার বিপক্ষে জবাবদিহি, পক্ষে সাফাই। যুক্তি পেশ আর যুক্তি খণ্ডন। দাবি করলো, নরসিংদী কলেজে বিএসসিতে পড়ালেখা করছে আর থাকা-খাওয়া হচ্ছে মহিলা হস্টেলে।

আমার বাবা ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার। সে সুবাদে নরসিংদী ছিলাম বেশ কিছুকাল। তাই মিথ্যাটা ধরতে পারলাম সহজেই। নরসিংদী কলেজে কোনো ছাত্রী হস্টেলই নেই। বাকি মিথ্যাগুলো ধরতে পারি আবারো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার পর।

নাদিয়া একই পরিচয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলতো। আমার সঙ্গে যা বলতো তার সঙ্গে বলতো একেবারে উল্টো। তখনই তার দুমুখো সাপের ভূমিকাটা ধরতে পারি আমি। ততোদিনে মাথায় একটা জেদ চেপে এসেছে। আবারো ফোন করলাম। পঞ্চান্ন মিনিট কথা বলার বিষয় ছিল একটাই। আমি নাম্বারটা কোথায় পেয়েছি। সঙ্গে ছিল আরো অনেক মিথ্যা কথা। যা কি না পরে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি।

এদিকে রাত জাগার কারণে পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছিল। ভাবলাম, শেষ একটা ফোন করে যে কথাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম, তা জানিয়ে দেবো আর তার কাছ থেকে সত্যগুলো জেনে নেবো। পাচ–ছয় দিন পর গায়ে জ্বর নিয়ে বাসার ছাদে উঠে ফোন করলাম।

তার প্রশ্ন ওই একটাই, নাম্বারটা কে দিয়েছে। কোথায় পেয়েছি। না বললে ফোন রেখে দেয়ার হুমকি।

এদিকে আমি আমার বন্ধুর অনুরোধের কারণে তার নামটাও বলতে পারছিলাম না। সেও ফোনটা রাখছিল না। তখনো বুঝতে পারিনি তার মনে কি লুকিয়ে আছে। সত্য বলার সুবাদে তাকে বললাম, আমি তোমার কিছুটা জুনিয়র। যেহেতু আমি তোমার কাছে আর কখনো ফোন করবো না তাই শেষ দিনে একটা সুন্দর বিদায় চাইছি।

সে যেন আমার বিদায়ের আয়োজনটা পূর্ব থেকেই করে রেখেছিল। নাদিয়ার ফোনটা হাতবদল হয়ে গেল কোনো এক বড় দিদির (সেই বড় দিদি নামে সম্বোধন করেছিল) কাছে। তারপর? তারপর ফোনটা কানের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। ক্ষোভে, দুঃখে গাল ভেসে গিয়েছিল অশ্রুতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, নাদিয়া! ফোনে ভালো ব্যবহার করার প্রতিদান বুঝি এই?

জবাবে কেটে দিয়েছিল লাইনটা।

পরে জেনেছি, আমি জুনিয়র শুনে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিল সে। নাদিয়া আমাকে কি মনে করেছিল জানি না। তবে আজ নাদিয়াকে বলছি, নাদিয়া, আমি তোমার কাছে অন্য কোনো কিছুই চাইনি। শুধু চেয়েছিলাম, শেষ দিন বড়র কাছ থেকে ছোটর জন্য সুন্দর একটা বিদায়।

saif.sword@gmail.com

টোকা

–রাজু

কথায় আছে, মনের দরজায় টোকা না দিয়ে দেহের দরজায় টোকা দিতে নেই। এই টোকা দেয়ার কাজে যে যতো বেশি পারদর্শী সে ততো বেশি নারীসঙ্গ লাভ করতে পারে। মন না জেনে হাত ধরতে গেলে খারাপ মেয়েরাও জাত তুলে গালমন্দ করে আবার টোকা যদি বেশি নগ্ন হয় সে ক্ষেত্রেও গালমন্দ অনিবার্য। তেমন এক ঘটনা নিজ কানে শুনেছি।

তখন আমার বয়স বারো থেকে তেরো। আমার এক দুষ্ট বন্ধু পাশের বাড়ির এক কাজের মেয়েকে বললো, এই রুকু, বরই পাড়তে যাবি?

রুকু বললো, না ভাই, কাটা ফুটবে।

বন্ধুটি চট করে বললো, *গামছা বিছায়া দিমুনি*।

রুকু আগুন চোখে বললো, *অয় জাউরা* (জারজ)। *তর বোনরে লিয়া যা।*

ঝাউতলা, বগুড়া থেকে

যমজ গোলাপ

কলেজে নবীন বরণের তখনো কয়েকদিন বাকি। কলেজে ঢুকেই দেখি এক সুদর্শন মায়াবী মুখ। গানের জন্য সবাই একটি ক্লাসে গেলাম। আবারও সেই মুখ। স্যার সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, সে এ কলেজের ছাত্র ছিল। সে এসেছে তোমাদের গানের প্রাকটিস করাতে।

তার সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব আমার খুব ভালো লাগলো। মনে মনে বললাম, কোন মায়ের সন্তান। আর সেই বা কার। যদি একবার আমায় বলতো ভালোবাসি তাহলে জীবনে আর কারো ভালোবাসার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু তা তো কখনোই সম্ভব নয়। না জানি কবেই সে অন্যের হয়ে গেছে। আমার ভাবনা এ পর্যন্তই শেষ। তাকে নিয়ে আর একবারও ভাবিনি।

নবীন বরণ এসে গেল। জীবনের প্রথম শাড়ি পরলাম। যখন আমি সংবর্ধনাপত্র পাঠ করছিলাম তখন দেখলাম সে আসছে। শুরু হলো নাটক পর্ব, সেই সঙ্গে হাসির বন্যা। সবাই হাসছে শুধু সে বাদে। মানুষ এতোটাই গম্ভীর হয়! সবশেষে গাইলো সে। আসিফের সেই *ভালোবাসা মানে হার মানা ক্ষতি*। সে আমার দিকে বার বার তাকিয়ে ছিল। কাকতালীয়ভাবে তার মোবাইল নাম্বার পেতে যাচ্ছি। এক টুকরো কাগজ দিলাম তাতে তার নাম ও নাম্বার লিখে দিল। পরের দিন কলেজে গেলাম। আমার বান্ধবী সোমা বললো, চল ফোন করি।

বললাম, আমি বলবো না। তুই বললে বলতে পারিস।

সে ফোন করলো। জানতে চাইলো আমার সঙ্গে কথা বলবে কি না। অনেকটা জোর দিয়ে বললো হ্যা হ্যা, বলবো। বিপদে পড়ে গেলাম। কি বলবো আমি।

কেমন আছেন বলতেই বললো, মনে পড়লো তাহলে। তোমার সঙ্গে সেদিন কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি।

ভীষণ অবাক হলাম। হেসে ফেললাম। বললাম, মাঝে মধ্যে ফোন করলে বিরক্ত হবেন?

না না। তুমি ফোন করলে আমি খুশিই হবো।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী। পরের দিন ফোন করেছিলাম, একটা নাম্বারও দিয়েছিলাম। সে ফোন করেছিল, আমিও করতাম।

একদিন বললো, দেখা হচ্ছে কবে।

এ কথা শোনার পর ভীষণ মন খারাপ হলো।

দেখা কেন?

বারে! আমি যার সঙ্গে কথা বলছি তাকে দেখবো না।

কিন্তু আমি যে দেখা করতে পারবো না।

সে আবার ফোন করে বললো, কবে দেখা হবে।

সমস্যায় পড়ে গেলাম, এখন কি করবো। সোমা আমাকে ছাড়ছে না। কেন যাবি না? একবার অন্তত যা। শেষ পর্যন্ত কথা দিলাম। ম্যাডামদের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। নবীন বরণের কথা উঠতে গিয়ে তার কথা উঠলো। ম্যাডামের মুখ থেকে শুনতে পেলাম তার পায়ে বড় সমস্যা আছে। কখনো দৌড়াতে পারবে না। আরো শুনলাম সে টিভিতে গান গেয়েছিল।

পরের দিন সোমা বললো, ছেলেটার অনেক সমস্যা আছে, বুকেও কি যেন হয়েছিল। অনেক সময় নাক মুখ দিয়ে রক্তও পড়ে। এ রকম মানুষ খুব কম সময় বাচে।

তার জন্য আমার খুব কষ্ট হলো। সে আমায় ফোন করেছিল। আমাকে বললো, কি ব্যাপার। খোজখবর নাও না।

আপনিও তো ফোন করেননি। কখন কবে আসবো ঠিক হয়ে গেল। সোমা আর আমি অনেক ঝামেলা এড়িয়ে গেলাম। টুকটাক কথা হলো। কিছুক্ষণ পরে শুরু হলো তার রাজ্যের কথা। বাবা সিলেটে চাকরি

করে। দুই ভাই এক বোন। দুলাভাই বন কর্মকর্তা, ছোট ভাই এইচএসসি-তে পড়ছে। আমার দিকে ফুল বাড়িয়ে দিল। কিন্তু নিচ্ছিলাম না। তাই ফুলটা ছিড়তে লাগলো।

বলি, ফুল কেন?

তুমি বোঝো না কেন? তাও বলতে হবে?

হ্যা হবে। আমি শুধু শুধু আপনার ফুল নেবো কেন?

তোমাকে ভালোবাসি তাই দিচ্ছি। ফুলটির একটি বৈশিষ্ট আছে। দূরের এক বাগান থেকে এনেছি। ফুলটি যমজ।

আপনি এটা ভুল করছেন। আপনি একজন শিল্পী। কতো সুন্দর মেয়ে আপনার জীবনে আসবে। আপনার তখন আফসোস হবে না?

সে আমার দিকে মায়াময়ভাবে তাকিয়ে থাকে। বলে, না হবে না।

যেমন তাকে অনেক বেশি ভালোবাসি তেমনি কষ্টকেও অনেক বেশি ভয় পাই।

আমি জানতে চাইলাম কখনো কষ্ট পাবো না তো।

বললো, না।

আমি তাকে অনেক জটিল প্রশ্ন করলাম। তার মধ্যে একটি ছিল তার জীবনে কেউ এসেছিল কিনা।

সে ভীষণ রেগে গিয়েছিল। কেন তুমি আমাকে এতো শক্ত প্রশ্ন করছো। তুমি কি আমার জীবনে আসনি? ঠিক আছে আর কখনো তোমাকে আসতে বলবো না।

অভিমান করে চলে গেল। নিশ্চিত হলাম সে আমায় ভালোবাসে। যা ভাবতেও পারিনি তা হলো। কয়দিন সে ফোন করছে না, আমিও না। শেষে আমিই করলাম। ভীষণ অভিমানে আছে। আমিই আসতে বললাম।

সে অনেকগুলো গান গাইলো। আমাকে চুপচাপ দেখে বললো, গান গাইছি তাই বিরক্ত হচ্ছো? তুমি এতো দূরে বসেছো কেন? তোমাকে ফেলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে আমায় ফেলে দিতেই টেনে নিল। তার শরীরে আমার শরীর লাগলো। অদ্ভুত অনুভূতি। দাও ফেলে দাও। তারপর ডাক্তারের কাছে দৌড়াতে হবে।

আমি কখনো দৌড়াতে পারবো না। তোমাকে বলেছিলাম না হেলিকপ্টার থেকে পড়ে পা ভেঙেছিলাম। সেই থেকে দৌড়াতে পারি না। কখনো পারবো না। আমি বুঝি না তুমি আমার মতো একটা পঙ্গু ছেলেকে কেন ভালোবাসলে।

পঙ্গু বলছো কেন?

তাহলে কি বলবো। আমি তো পঙ্গু।

প্লিজ চুপ করো।

সে আমার দিকে চেয়ে থাকে। শুধুই চেয়ে থাকে। আমি ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিলাম। তার মাথার ক্যাপ দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিচ্ছিলাম। কিন্তু সে সরিয়ে ফেলে। বলে, শুধু ঠোট দুটো দেখতে দাও। নীরবতা ভাঙিয়ে বললো, ম্যাডামের হাতটা ধরা যাবে?

হাত ধরবে কেন?

দাও না ধরি। আচ্ছা, তুমি বার বার এদিকে তাকাচ্ছো কেন, সেখানে কি আরেকটা স্বামী রেখে এসেছো। অন্যদিকে বার বার মুখ সরিয়ে নিচ্ছো। এদিকে তাকাও।

কি সব কথা বলছো।

হাতটি আমার ধরলো। আমার অস্বস্তি দেখে ছেড়ে দিল। বলি, হাত ধরে কি হবে?

না ধরলাম।

আমি হাসি, সেও হাসে। যখন জানলো আজ আমার জন্মদিন তখন উদ্ভট এক আবদার।

তোমাকে একটা...।

কি মানুষ তুমি।

তোমার আজ জন্মদিন। কিছু একটা তো দিতে হয়। আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছে। প্লিজ দাও না। মাত্র একটা!
ছিঃ ছিঃ চুপ করো। সে বললো, আমার বিয়ে করতে এখনো দশ বছর বাকি। তুমি অপেক্ষা করতে পারবে?
হু পারবো। দশ বছরে কি বুড়ি হয়ে যাবো।
তার ঝটপট উত্তর। হ্যা।
বুড়ি হলে করবে না!
নাহ, তুমি কি চাও তোমার ভালোবাসার মানুষটা একটি বুড়িকে বিয়ে করুক।
কি স্বার্থপর। আমার মন খারাপ দেখে হেসে ফেলে। মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দেয়। আরে আমি তোমার সঙ্গে মজা করছি। দশ বছর পর তুমি আমার মতো ইয়ং ছেলে পাবে। কিন্তু আমি তোমার মতো ইয়ং মেয়ে পাবো না আর কখনো বিয়ে করবো না। আমার অনেক সমস্যা আছে।
পরের দিন ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমাকেই ফোন করতে হলো। আবার দেখা হলো। আমি জানতে চাই ফোন করো না কেন?
সে বললো। তোমার কি হয়েছে। তুমি বুঝতে চেষ্টা কর, আমি বেশিদিন বাচবো না। আমার অনেক অসুখ আছে। তোমাকে কষ্ট দিতে পারবো না।
আমি সব জানি। আমি সব মেনে নিয়েছি। সব কিছু জেনেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি।
না। তুমি সব জানো না। আমার মাথায় অনেকগুলো টিউমার আছে। ডাক্তার বলেছে আমি বেশিদিন বাচবো না। তুমি জানো না মাধবীকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। তার জীবন থেকে সরে এসেছি।
তাহলে আমাকে এতো আশা দিলে কেন?
যদি তোমাকে আশা দিতাম তাহলে আরো ঘুরতাম। তোমাকে আশা দিইনি। আরো এনজয় করতে পারতাম। কিন্তু করিনি।
আমি অঝোরে কাদছি। চোখের পানি থামছেই না। তুমি আমাকে অনেক আশা দিয়েছো। তুমি আমাকে বৌ বলেছো। কেন বলেছো?
সে খুব ছটফট করছে। আমাকে বলে দেখো আমার বুকটা লাল হয়ে যাচ্ছে। যখন ব্যথা ওঠে তখন এমন হয়। সত্যি তার ফর্শা বুকে লাল দাগ ফুটে উঠছে। তুমি যাও আমাকে আর ঋণী করো না।
অনেক কষ্টে বললাম, তুমি মাধবীর কাছে ফিরে যাও। আমাকে শুধু সপ্তাহে একবার ফোন করবে।
সম্ভব না। তুমি যাও, কথা দিচ্ছি ফোন করবো।
অনেক কষ্টে ফিরে এলাম। শুরু হলো যন্ত্রণাময় জীবন। ফোনের অপেক্ষায় ছটফট করতাম। সে একবারও ফোন করেনি। আমিই করতাম। মাঝে মধ্যে সান্ত্বনা দিতো। বলতো চিন্তা করো না। ভালো করে পড়াশোনার করো। বহুদিন পরে আবার দেখা হলো। এতো সুন্দর ও, শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়, পারি না। অভিযোগ করলো এতোক্ষণ পরে এলে কেন। আধা ঘণ্টা আগে এসেছি।
তুমি কষ্ট পেয়েছো!
পাবো না। আমাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই।
কষ্ট পেলে মানুষ অসুন্দর হয়। তুমি তো সুন্দর হয়েছো। আজ একটু কাদো না।
কদিন আগে দেখলে চিনতে হতো না। তার কথা শুনে মনে হলো নতুন করে আমায় ভালোবাসছে। মাধবীর কথা বলি অনেক কিছু জানতে চাই। সে আমার হাত ধরতে চায়। বলি, মাধবী, কষ্ট পাবে। শেষ পর্যন্ত ধরে। আবারও উদ্ভট আবদার আমার হাজারবার আপত্তি।
সে নাছোড়বান্দা।
বাধ্য হলাম তার আবদার মেনে নিতে।
কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিলাম মাধবীর কথা। মিনতি করে বলে, আমাকে জড়িয়ে ধরো না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে এগিয়ে দাও।

চলে এলাম। একটা বকুলের মালা দিয়ে এলাম। ফিরে আসার এক সপ্তাহ পর ফোন করলাম। সে আমার ফোনে আগ্রহী না। আমি ভীষণ অবাক হলাম। ফোন করার কথা ছিল তার। দেখা করার আবদার ছিল তার। কিন্তু এখন! পনেরো দিন পর আমিই ফোন করলাম। বললাম, ঢাকা যাচ্ছি, শেষবারের মতো দেখা করতে চাই।

উত্তর এলো, জানতে চাইলো ঢাকা যাচ্ছি কেন?

আমি খুব কাদছি। কান্না থামাতে পারছি না।

কান্না থামাও, কি হয়েছে বল। কান্না বন্ধ না করলে আমি চলে যাবো। অনেক কষ্টে বললাম, আমার একটা বাজে অসুখ হয়েছে। এইচআইভি না কি যেন।

সে বললো, কখনো কারো রক্ত নিয়েছিলে।

না। তবে রক্ত পরীক্ষা করেছিল। আমাকে বোঝাতে চাইলো। ওটা ভুল। তুমি রিপোর্ট নিয়ে এসো আমি দেখবো। আর ফোন করো আমি আসবো।

ফোন করেছিলাম সে আসেনি। নির্লজ্জের মতো বলেছিল, কাজ আছে।

বহুদিন পরে আবার দেখা। সে আমাকে সহজ করতে চাইছে। কি করে ভুলি আমার দুঃসময়ের কথা। অনেকক্ষণ থাকতে চাইলো। কিন্তু আমি চলে এলাম।

আমার চলে আসার দিকে সে মায়াবীভাবে তাকিয়েছিল। সে অনেক সময় নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, আজ তোমার সঙ্গে কতোক্ষণ থাকতে হবে বলো। অনেক সময় নিয়ে এসেছি। বাড়িতে আসার পর নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। তার মলিন মুখটি বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমিই তাকে আসতে বললাম। সে আমায় অনেক আশা দিল। আমি যে তার এটাও জানিয়ে দিল।

কিন্তু আবার যখন ফোন করলাম। সে আমায় বললো, বিদেশ চলে যাবে। সে কি জানে না সে দেশের বাইরে গেলে আমি কি করে বাচবো। না, সে আমার কোনো কথাই শুনলো না।

বললাম, তুমি আমার থেকে মুক্তি চাও? ঠিক আছে, আমি মরে যাবো, তোমার মুক্তি মিলবে।

ফোন রেখে দিলাম। তারপর কি হলো না-ই বললাম।

সোমা তার নাম্বারে লাইন না পেয়ে তার ফ্রেন্ড না কাকে যেন ফোন করে হাসপাতালে আসতে বলেছিল। কিন্তু আসেনি। একটিবারের জন্যও দেখতে আসেনি আমাকে। আমি পথ চেয়ে ক্লান্ত হয়েছিলাম।

১৩ জুন তার জন্মদিন। আমিও অসুস্থ তার ফ্রেন্ডকে বললাম। আজ তার জন্মদিন, তাকে বলবেন আমি তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।

তিনি বললেন, তুমি তাকে ভুলে যাও।

না, ভুলবো না। মনে রাখবো। সারা জীবন মনে রাখবো।

তিনি বললেন, একতরফা কাউকে ভালোবাসতে নেই। সে নাকি তাকে বলেছিল আমাকে সে চেনে না। ফোন নামিয়ে রাখি। ভীষণ কষ্ট পেলাম। কখনোই ভাবিনি তার বাড়িতে আমি যাবো। কিন্তু গিয়েছিলাম। আমারই বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমি তার বাড়িতে এসেছি। তাকে পাইনি, সিলেটে গিয়েছিল। তার মাকে দেখেছি। খুব শান্ত ও সুন্দর। মাকে কিছুই বলিনি। অন্য কথাবার্তা হলো। তার ভাগ্নি দুজনের ছবি দেখতে চাইলাম। তার ভাগনি দুজনের নাম রাফিন রাতিন। তার মা তিনটি অ্যালবাম নিয়ে এলো। আমি খুব কষ্ট পেলাম তার জন্মদিনের ছবি দেখে। তার চার পাশে মেয়ে বন্ধু। হাস্যউজ্জ্বল সে। কষ্টে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ইচ্ছা হচ্ছে কাদি। কিন্তু তা সম্ভব না। তার মা আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করলেন। মনে করি কয়েক মাস আগের কথা, কে সে ভাগ্যবতী মা। কিন্তু আজ বলি হতভাগিনী মা।

কতোদিন হয়ে গেল। মাঝে মধ্যে তার দেয়া যমজ গেলাপটিকে নেড়েচেড়ে দেখি। সুবাস নিতে পারি না। অনেক আগেই তা ফুরিয়ে গেছে। শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে গেছে। তাকে দেখানো হলো না আমার যমজ বোনটিকে।

বোন আমায় বললো, কতোদিন ফুলটি রাখবি?
বললাম, যতোদিন পারি।

পূর্ণ নাম ও ঠিকানা বিহীন, রংপুর থেকে

মামা

–শহীদুল ইসলাম

জীবনে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন দেখতাম সমাজের উচু তলার একজন হওয়ার। একটি সুখী সমৃদ্ধ জীবন গড়ার। বইয়ের পাতায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পড়তাম আর ভাবতাম, যদি তাদের মতো একজন হতে পারতাম! শুধু স্বপ্নই দেখতাম না, তা পূরণ করার জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করতাম। বড় হওয়ার জন্য লেখাপড়ার কোনো বিকল্প নেই। আর তাই সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে যতোটা সম্ভব বই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চেষ্টা করতাম।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। একত্রে চল্লিশ–পঞ্চাশটা পরিবারের বাস। তাই সমবয়সী ছেলেমেয়ের সংখ্যাও ছিল অনেক। সারা বাড়িতে ছিল একটি মাত্র টিভি। পাড়ার ছেলে–বুড়ো প্রায় সবাই টিভি দেখতে আসতো। এ জন্য টিভির চেয়ে মানুষের কোলাহল বেশি শুনতে পেতাম। সবাই টিভি দেখলেও আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। খেলাধুলার ব্যাপারেও একই কথা। লেখাপড়াটাই ছিল আমার ধ্যান–জ্ঞান। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য বছরের শুরুতেই আদা–জল খেয়ে লাগতাম। দেখা যেতো সমবয়সী অন্য ছেলেরা যখন খেলছে অথবা টিভি দেখছে তখন আমি বই সামনে নিয়ে আছি। বাড়িতে এবং স্কুলে এ জন্য অনেকেই বিদ্যার জাহাজ বলে খেপাতো। আমার আসল আনন্দ ছিল পরীক্ষার ফলাফলের দিন। সবাই যখন গোমড়া মুখে বাড়ি ফিরতো তখন ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমার মুখে থাকতো হাসি।

ছোটবেলার সেই হাসিমাখা মুখটি এখন প্রায় সময়ই ভারি বর্ষার ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো কালো হয়ে থাকে। নিজের ভুলেই হোক আর কঠিন বাস্তবতার কারণেই হোক অথবা বিধাতার অদৃষ্ট লেখনীর কারণেই হোক জীবনের মাঝ পথে আমাকে থমকে দাড়াতে হয়েছে। ১৯৯৭ সালে বি. শাসন উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৯৯৯ সালে জিবিজি ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার নিয়ে পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরও আজ আমি একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। দারিদ্র আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক বছরের বেশি পড়ার সুযোগ দেয়নি। যে বয়সে ব্যাগ কাধে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার কথা সেই বয়সে আমাকে কাধে নিতে হয়েছে একটি পরিবারের দায়িত্ব।

বর্তমানে আমি বাংলাদেশের একটি সরকারি মেডিকাল কলেজে মেডিকাল টেকনলজিস্ট পদে চাকরি করছি। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পদের বাছবিচার না করে গড়পড়তা সবাইকে মামা বলে সম্বোধন করে। এই মামা ডাক নিয়ে প্রায়ই ইতস্ততার মধ্যে পড়তে হয়। যখন দেখি একজন রিকশাওয়ালা, একজন হোটেল বয় অথবা একজন পান–সিগারেট বিক্রেতাকেও মামা বলে সম্বোধন করছে মনটা তখন বিষণ্ণতায় ভরে যায়। ভাবি একজন চানাচুর বিক্রেতা আর এই আমার মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে? হয়তো আছে অথবা নেই। তবে এখানকার মেডিকাল স্টুডেন্টদের কাছে ডাক্তার ছাড়া সবাই তুচ্ছ। অন্তত তাদের কথাবার্তা ও আচার–আচরণে তাই মনে হয়।

বিদেশি ডাক্তার, নার্স, মেডিকাল টেকনলজিস্ট একজনকে আরেক জনের সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হলেও আমাদের দেশের অবস্থা ভিন্ন। এখানে একজন মেডিকাল টেকনলজিস্ট, একজন নার্সকে ডাক্তারের হুকুমের দাস মনে করা হয়। বক্তৃতা, সেমিনারে যতোই বলা হোক নার্স, মেডিকাল টেকনলজিস্ট, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ, কার্যক্ষেত্রে তাদের মূল্যায়ন কতোটুকু তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই বুঝতে পারেন। আমার কাজ হলো প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন ধরনের টিস্যুর স্লাইড দেখানো। সুতরাং

প্রতিনিয়তই আমাকে মামা ডাক শুনতে হয়। এমনকি আমার নিজস্ব স্কুল–কলেজের পরিচিত দু'একজন যারা আমাকে ভাই বলতো এখন তারাও মামা ডাকে। আর দেখা হলে এমন ভাব করে যেন তুমি ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলে তাতে কি হয়েছে, আমি এখন মেডিকালের ছাত্র। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা কারো সঙ্গে বলি না। কেবলই মনে হয় এদের চেয়ে আমার যোগ্যতার কি কোনো কমতি ছিল? তাহলে আজ আমাকে কেন মামার পোস্টে চাকরি করতে হচ্ছে। এই কষ্ট সর্বদাই আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

মনে পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষকের কথা যার কাছে গিয়েছিলাম একটু পরামর্শের জন্য। কোনো পথ বাতলে দেয়া তো দূরের কথা ধমকের সুরে বলেছিলেন, টাকার সমস্যা হলে পড়াশোনা ছেড়ে দাও। গ্রামের বোকা–সোকা ছেলে এই আমি সেদিনই ইউনিভার্সিটির লেখাপড়া চুকিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। পাশে দাড়ানোর মতো কাউকেই খুজে পাইনি। এখন মনে হয় যদি কারো একটু সহযোগিতা পেতাম তাহলে এদের মতো আমিও গায়ে এপ্রন জড়াতে পারতাম। কিশোর বয়সে গাইতাম *আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়*। আর এখন শুনি কিশোর কুমারের গাওয়া *মেরা জীবন কোরা কাগজ, কোরাই রেহ গেয়া*।

যা হোক, সেদিন রবিবার ২০০৫–২০০৬ সেশনের মেডিকাল ভর্তির ফরম বিক্রির ডিউটি করছিলাম। আমার কাজ প্রবেশপত্রে রোল নাম্বার বসানো। নিচের দিকে তাকিয়ে কাজ করছিলাম। *মামা প্রবেশপত্রটা একটু তাড়াতাড়ি দেন ওয়ার্ডে যেতে হবে*। কণ্ঠটা খুব পরিচিত মনে হলো। উপরের দিকে মাথা তুলে তাকাতেই সারা শরীরে হিম শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়ে গেল। স্বভাবসুলভভাবে আমি চুপচাপ থাকলাম। আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, আপনি মানে তুমি শহীদুল না। মাথা ঝাকিয়ে উত্তর দিলাম, হ্যা। আমি কতোদিন হলো এখানে আর কোন পোস্টে আছি জানার পর সে বললো, প্রার্থী তার ছোট বোন আর সে এখন ইন্টার্নি করছে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করে চলে গেল। আমিও বিষয়টাকে তেমন কিছুই মনে করলাম না। তার সঙ্গে আর কিছু বলার ইচ্ছাও জাগলো না। ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকলে হয়তো আজ এভাবে লিখতে হতো না।

আমি কোয়ার্টারে ব্যাচেলর মেসে থাকি। শীতের সময় অফিস থেকে মেসে খুব কম সময়ে যাওয়া যায় হাসপাতালের ভেতর দিয়ে। যাওয়ার পথে আরো দুই–তিনদিন দেখা হলো। আমাকে দেখলে অন্যদিকে তাকিয়ে চলে যায় অথবা তার সঙ্গে থাকা অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ভাবটা এমন যেন আমাকে সে দেখতে পায়নি। কয়েকদিন পর হঠাৎ সে আমার রুমে এলো। সৌজন্যবশত তাকে বসতে বললাম।

সে আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, না বসবো না। দেরি হয়ে যাবে। আমার ওয়ার্ডে ডিউটি আছে। প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গেই বললো, দেখো তোমার সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু আজ আমি একজন ইন্টার্নি ডাক্তার আর তুমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী। তোমার সঙ্গে প্রায় দেখা হলেও আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয় না। কারণ এখন পরিস্থিতি ভিন্ন রকম। তুমি কিছু মনে করো না।

কিছুক্ষণ নির্বিকার থেকে আমি বললাম, বসন্তকালে গাছের যে শোভা দেখা যায় শীতকালে পাতা ঝরার দিনে তাকে খুজে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর এই পার্থক্যটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। ব্যস্ততা থাকলে আপনি এখন যেতে পারেন।

সে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যাওয়ার পর তার বন্ধুত্বের গভীরতার কথা মনে করে ফিরে গেলাম ১৯৯৩ সালে যখন আমি ক্লাস সেভেনের ছাত্র। বয়স আর কতো হবে। বারো–তেরো বছর। পুরোপুরি কৈশোর কাল। তার বাবা একজন পুলিশ অফিসার, সম্প্রতি বদলি হয়েছেন রাঙ্গামাটি জেলার পানছড়ি থানায়। সেখানে ভালো কোনো স্কুল না থাকায় নানার বাড়িতে থেকে তাকে পড়তে হবে। পাশেই গার্লস হাই স্কুল থাকলেও প্রতি বছরই আমাদের বয়েজ হাই স্কুলে দুই–একজন মেয়ে ভর্তি হতো। তার নানা ছিলেন আমাদের স্কুলের বিএসসি শিক্ষক। নাতনিকে তিনি গার্লস স্কুলে না দিয়ে নিজের স্কুলেই ভর্তি করালেন। ভালো ছাত্র হিসেবে এবং

ক্লাসের ক্যাপটেন হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে ছিল আমার আলাদা কদর। প্রথম দিন শরাফত স্যার আমার সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর বললেন, আমি যেন তাকে সহযোগিতা করি। তার পর থেকে স্কুলের কোন স্যার কেমন, কে বেশি ছাত্রদের মারেন, কে বেশি আদর করেন, কাকে দেখলে ছাত্ররা একশ হাত দূরে থাকে – সবই আমার কাছে জানতে চায় সে।

কোনো পড়া বুঝতে না পারলে আমাকে ছাত্রীদের কমন রুমে গিয়ে তা বুঝিয়ে দিতে হয়। কোনো কোনো দিন পড়া বোঝানোর নাম করে বিভিন্ন ধরনের গল্প জুড়ে দিতো। এভাবে মিশতে মিশতে লাজুক এই আমি খুব ফৃ হয়ে গেলাম। প্রতিদিন আমাকে তার সঙ্গে টিফিন করতেই হতো। আর যেদিন সব কয়টা ক্লাস হতো না সেদিন সবার সামনে আমার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতো স্কুল আঙিনার বিভিন্ন পয়েন্টে।

এতোটুকু বয়সে শুধু বন্ধুত্বের মাঝেই আমাদের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল নাকি বন্ধুত্বের গণ্ডি পেরিয়ে ভালোবাসার সীমানায় প্রবেশ করেছিল তা আজ আর না–ইবা বললাম। তবে অন্যদের কাছে শুনেছি আমি কোনোদিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে সেদিন নাকি সে পড়ায় মন বসাতে পারতো না। আমার খবর জানার চেষ্টা করতো অন্যদের কাছে। পরের দিন আমাকে কৈফিয়ত দিতে হতো কেন অনুপস্থিত ছিলাম।

একদিন পঞ্চম পিরিয়ড অফ থাকায় টিফিন পিরিয়ড মিলিয়ে পুরো দেড় ঘণ্টা বকুলতলায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কথার ফাকে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সঙ্গে এভাবে খোলামেলাভাবে চলতে তোমার লজ্জা লাগে না?

আমাকে অবাক করে দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে সে বললো, সকলের সামনে আমি তোমাকে একটু চুমু খাবো। কি, তোমার বিশ্বাস হয় না!

আমি হ্যা সূচক মাথা নাড়লাম। কারণ যদি না করি তাহলে নিশ্চিত সে কাজটা করে বসবে।

এভাবেই চলছিল সোনালি সেই দিনগুলো। আমাদের এরকম চলাফেরা দেখে অনেকে হিংসা করতো। আবার কেউ কেউ আমাদের স্যার অর্থাৎ তার নানার কাছে নালিশ করতো। যদিও এতোদিনে ব্যাপারটা স্কুলের দফতরি থেকে শুরু করে হেড স্যার পর্যন্ত সবাই জানতেন।

বার্ষিক পরীক্ষার সামনে হঠাৎ একদিন হেড স্যার আমাকে ডাকলেন। স্যারের রুমে গিয়ে দেখি আরো কয়েকজন স্যার বসে আছেন। তারা সবাই আমাকে বোঝাতে চাইলেন, আমি একজন ভালো ছাত্র। এ বয়সেই মেয়েদের সঙ্গে চলাফেরা করলে ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।

স্যারের রুম থেকে বের হয়ে ক্লাস রুমে ফিরছিলাম। সে কমন রুম থেকে ইশারায় আমাকে ডাকলো। আমি সাড়া না দিয়ে চলে গেলাম। একটু পরে স্যারের পিছু পিছু ক্লাসে ঢুকলো সে। সম্ভবত সেটা ছিল পরীক্ষার সাজেশন ক্লাস।

ক্লাস শেষে সে জিজ্ঞাসা করলো, হেড স্যার কি বলেছেন?

বললাম, পরীক্ষার এ কয়দিন তোমার সঙ্গে একটু কম মিশতে বলেছেন।

শুনেই তার মুখটা গোমড়া হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম কষ্ট পেয়েছে। পরীক্ষার পর বেশি মিশবো এরকম কথা বলে তাকে সহজ করার চেষ্টা করলাম।

পরীক্ষা হয়ে গেল। শেষ পরীক্ষার দিন সে বললো, পরীক্ষা শেষে আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করে যাই।

পরীক্ষা শেষ করে যখন হল থেকে বের হচ্ছি দেখি সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কমন রুমে গিয়ে কাদতে কাদতে বললো আজকেই সে তার দাদার বাড়ি চলে যাচ্ছে এবং তাকে সেখানকার স্কুলেই পড়তে হবে। সে আমার হাত ধরে বললো, আমি যেন তাকে ভুলে না যাই। যাওয়ার সময় মোড়ানো একটি কাগজ পকেটে গুজে দিয়ে বললো, বাড়িতে গিয়ে যেন খুলি।

বাড়িতে এসে কাগজটি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিই এবং তা বেমালুম ভুলে যাই। ২৯ তারিখে পরীক্ষার রেজাল্ট হলো। আমি প্রথম, সে দ্বিতীয়। তার পক্ষে তার নানা পুরস্কার গ্রহণ করলেন। তার অনুপস্থিতি সেদিন ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাকে। বাড়িতে এসে কাগজটি খুলে দেখি একটি চিরকুট।

শহীদ

আমার কচি অবুঝ মনে তুমি যে দাগ কেটেছো তা কোনোদিন মুছবে না। জানি তুমি লেখাপড়ায় খুব সিরিয়াস তারপরও বলছি, তুমি খুব ভালো করে পড়াশোনা করবে। আমি সব সময় তোমার জন্য দোয়া করবো। তুমি যেন আমাকে ভুলে যেও না। আমাদের দেখা হবে হঠাৎ করেই কোনো একদিন কোনো ইউনিভার্সিটির বারান্দায়।

ইতি

রূপা

হ্যা, তার সঙ্গে দেখা হলো ঠিকই কিন্তু অন্যরূপে। কারণ এই এগারো বছরে খরস্রোতা নদীর মতো সদা বহমান জীবন নদীর পাড় ভেঙেছে অনেক আবার চরও জেগেছে অনেক।

আর তাই হয়তো এখন আমি মামা। আর সে ...

ব্রাহ্মণ শাসন, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল থেকে

শাপলা

–সাইফুল মোর্শেদ রিংকু

যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন সে অর্থাৎ আমার প্রেমিকা ধরা যাক তার নাম অনামিকা আর আমি দুজনে প্রায়ই সিনেমা দেখতাম স্কুল ফাকি দিয়ে। বাড়ি ফিরে মিথ্যা কথা বলতাম। অনামিকাকে কেন্দ্র করেই আমি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতাম। রঙিন স্বপ্ন দেখতাম।

আমি রাজনীতি করতাম। সে ছিল রাজনীতির ঘোর বিরোধী। কলেজে যখন মিছিল-মিটিং করতাম, তখন প্রায়ই আমাকে ডেকে বলতো, প্রিয়, রাজনীতি না করলে হয় না।

আমি বলতাম, রাজনীতিই হলো বাঙালি তরুণের সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

শত বারণ করেও সে আমাকে রাজনীতি থেকে ফেরাতে পারেনি।

একদিন এই রাজনীতির কারণেই দশ বছরের সাজা নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যেতে হয়েছিল।

জেলে থাকার সময় এক শীতের সকালে সে আমাকে দেখতে এসেছিল। হাতে একটি রক্তগাদা আর সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে বলেছিল, কবে ফিরবে জানি না। তবে তোমার জন্য আমি আছি, থাকবো চিরদিন তোমার অপেক্ষায়।

আমি বলেছিলাম, মিথ্যা অপেক্ষা করে লাভ নেই। আমার জামিন বা খালাস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। হয়তো দশ বছরই খাটতে হবে। তাছাড়া আসামি আসামিই। এ কলংক তুমি মুছবে কিভাবে?

অনামিকা মুখে হাত রেখে বলেছিল, চুপ করো।

পরক্ষণেই বলেছিলাম, পারলে ভালো পাত্র হলে, ভালো ঘর পেলে, বিয়ে করে সংসার করো। আমার জন্য অপেক্ষা করা আর বৈশাখী মেঘের কাছে জল চাওয়া সমান।

ও নিয়মিত চিঠি দিতো জেলে। চিঠি পড়ে মাঝে মধ্যে নিজের অজান্তে চোখে পানি আসতো। আর তখন ভাবতাম অনামিকা যে আমার কি।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫-এ যখন জেল থেকে জামিনে বের হলাম, তখন শত মুখের ভিড়ে একটি মুখ আশা করেছিলাম জেলগেটে। কিন্তু বিধি বাম, সে মুখের দেখা পেলাম না। বাড়ি ফিরে পরদিন তার বাসায় গিয়ে তার রুমে ঢুকতেই দেখতে পেলাম সে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে। পেছন থেকে কাছে গিয়ে তার চোখ দুটো আমার হাত দুটি দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। সে জোর করে হাত ছাড়িয়ে পিছু তাকিয়ে আমাকে দেখামাত্র রেগে গেল। ভাবলাম এ রাগ হয়তো ক্ষণিকের। কিন্তু দিন যতো গড়াতে লাগলো ততোই

দেখতে পেলাম আমার আগের অনামিকা আর বর্তমান অনামিকার মধ্যে অনেক পার্থক্য। পার্থক্য তার চলনে–বলনে। আমাকে সে এড়িয়ে যেতে চায়। সর্বদা মুখ মলিন হয়ে যায়।

একদিন সকালে জানতে পারলাম আগামী মাসে তার বিয়ে। ছেলে বড় ব্যবসায়ী, ঢাকায় থাকে। বিয়ের সপ্তাহ খানেক আগে আমাকে একটি বিয়ের কার্ড আর একটি লাল শাপলা দিয়ে বলেছিল, আমি জলে ভাসা পদ্ম কি না জানি না, তবে জলে ভেজা শাপলা। শাপলা গন্ধহীন ফুল, তাই তোমার হৃদয়ে আমার গন্ধ আর কোনোদিন ছড়াবে না।

উত্তরে আমি বলেছিলাম, আমি দুঃখ পেলেও খুশি হলাম জেনে।

সেদিন থেকে যতোবার অনামিকার কথা ভেবেছি, ততোবার আমার হৃদয় দুমড়ে–মুচড়ে একাকার হয়েছে।

পাংশা, রাজবাড়ী থেকে

এ জীবনে দেখা হলো না

–মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন

১২ মার্চ ২০০৬–এ আমাদের বিয়ের আটাশ বছর পূর্ণ হবে। *জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে এ সবই নিয়তি*। এ প্রবাদ বাক্য যে ঠিক তার প্রমাণ পেলাম। বিয়ে করবো বা সংসার করবো, এমন ভাবনা অনেকের থাকলেও আমার ভেতরের সুর ছিল একটু উল্টা। হয়তো কারণও ছিল। আমি নতুন বাংলাদেশ প্রথম ব্যাচের ইঞ্জিনিয়ার। ঢাকায় চাকরি করছি। বিয়ের প্রস্তাবও আসছে মাঝে মধ্যে। এক সময় ডা. হাদিকে মনের কথাটা বলেছিলাম, *সংসার মানে সং সাজাই সার*। বন্ধু চোখ বড় করে তাকিয়ে ছিল, আমার সংসারবিমুখতায়।

বাবা ১৯৩৮ সালে ঢাকা মিটফোর্ড থেকে পাস করা ডাক্তার। হলে কি হবে, আমরা বারো ভাইবোন। আমি মেজ সন্তান, তাই বাবার সংসার জাহাজের হাল ধরা নয় – দাড় বাইতে হচ্ছে আমাকে। আপন বা নিজ বলে চিন্তা করার অবসর কই।

১৯৭৭ সাল, ছাতক পাল্প মিলের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছি, উদ্দেশ্য ঢাকায় এটমিক এনার্জি কমিশনে সিনিয়র মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগদান করা। ভালো সরকারি চাকরি, পাচটা অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টও দিয়েছে। ইস্তফার নোটিশের সময় দিন গুনছি ছাতকে।

এলো নিয়তির প্রসারিত হাত। বন্ধু প্রধান মেডিকাল অফিসার–এর সুন্দরী শ্যালিকা এসেছেন ক্লাব হাউসে একটা অনুষ্ঠানে। দেড় ডজন ব্যাচেলর অফিসারের লাইনে রীতিমতো ভিড়।

অনুষ্ঠান শেষে পাল্প সুপার সালেহুর বললো, *তোর ভাবী ডেকেছে, দেখা করে আয়।*

জো হুকুম।

ভাবী আমাকে বসিয়ে রেখে তাকে ডেকে আনলো।

বললো, তোমরা কথা বলো, আমি চা নিয়ে আসি।

কি কথা বলবো?

জানলাম শুধু সে সুন্দরীই নয়, ভালো ছাত্রীও। সিলেট মহিলা কলেজে ভর্তি হয়েছে প্রথম বর্ষে। সামনের সপ্তাহে ক্লাস শুরু, তার আগে বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নাটকের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ।

দুই সপ্তাহ পর আবার সে বোনের বাসায় এলো। সালেহুর ভাবীর আবার তলব, আলাপ করো।

আমি রাজশাহীর আর সে সিলেটের। তার জন্ম ঢাকাতে হলেও বাবা খাদ্য বিভাগ থেকে অবসর শেষে দেশে (সিলেটে) ফিরে এসেছেন। বর্তমানে একটা গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

তাকে বললাম, তুমি এনগেজড না থাকলে প্রস্তাব দেবো?

তার উত্তর, আপনার কিছু বলার থাকলে দুলাভাইকে বলেন, আমি এসব জানি না।

ডাক্তার ভাইকে জানানো হলো, দুই পক্ষের আলাপ শুরু হলো। ইতিমধ্যে আমি ঢাকায় এটমিক এনার্জি কমিশনে।

শেষ কথা দাড়ালো, ছেলে মেয়ে উভয়েই উপযুক্ত, কিন্তু বাদ সাধলো আমার পক্ষ, এতো দূরে সম্বন্ধে রাজি নয়। তার পক্ষ – সিলেটের বাইরে রাজি নয়। ডাক্তার ভাইয়ের শত চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

তৃতীয় পর্ব। ওই মেয়েটা আমাকে ডেকে পাঠালো তার কলেজ হস্টেলে।

এখন কি করবেন?

আমার উত্তর, কোনো পক্ষই রাজি না। এরপর কি করা যায়, চিন্তা করে দেখি।

কিছুদিন পর আবার টেলিগ্রাম *কাম শার্প*।

তার হস্টেলে হাজিরা দিতেই জানালো, যাই করেন, খুব তাড়াতাড়ি। লন্ডনি প্রস্তাব এসেছে, পার পাওয়া যাবে না।

বিরাট সমস্যা, রাস্তাও খোলা নেই।

বললাম, তোমার সাহায্য ছাড়া আর কোনো রাস্তা দেখছি না।

ওরে বাপরে, আমি পারবো না।

আমি বললাম, তাহলে ওয়ালাইকুমুস সালাম।

ভয়ে কাপতে কাপতে বললো, ছাতক যাচ্ছি বিকালে, কাল আপনি কানিজের (বর্তমানে ডাক্তার) বাসায় আসেন। তার সঙ্গে আলাপ করে দেখি।

ছাতকে দেখা হলো, পরে পরিকল্পনা হলো, এরপর তারিখ হলো, কিন্তু নিয়তি? ১১ মার্চ ১৯৭৮ ওসমানী এয়ারপোর্টে সকাল সাতটা চল্লিশে আমরা বিমান মিস করলাম। আসলে বিমান তখনো দাড়িয়ে কিন্তু আমাদের সিটের বোর্ডিং পাস অন্যদের দিয়ে দিয়েছে।

অগত্যা বাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে রাত নয়টায় ঢাকা পৌছালাম। সে তো ভয়ে সারাদিন এক ফোটা পানিও খায়নি।

সকালে বন্ধুরা ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে গেছে। পল্লবীতে তখন ভাড়া থাকি। কাজী, রেজিস্ট্রি ইত্যাদি হতে রাত বারোটা। ভাগ্য ভালো রাতে সে কান্নাকাটি করেনি।

পঞ্চম দিনে বাসায় কলিং বেল। দরজা খুলে দেখি ডাক্তার ভাই, ছাতক থেকে। কেমন আছো তোমরা?

ততোক্ষণে সে বাথরুমে নিজেকে বন্দী করেছে। আজীবন এই দুলাভাইকে নিজ ভাইয়ের মতো জেনে এসেছে, তাই তার সামনে আসতে বড় কুণ্ঠা। পরে বাথরুম থেকে সে বেরিয়ে এলো। অনেক বকা দিল তাকে। একটু খবর তো দিতে পারতি।

যাই হোক, ডাক্তারভাই দায়িত্ব নিলেন সব কিছু ব্যবস্থা করবেন। বিকালে তার চাচার বাসায় নেয়া হলে সম্বন্ধী মেজর আমাদের খুব করে বকা দিলেন। পরের দিন আমার ছোটভাই তাকে সিলেট মহিলা কলেজে রেখে এলো। দিন দশেক পরে আমার ডাক পড়লো ছাতক পাল্প মিলে ডাক্তারভাইয়ের বাসায়। ছোট–খাটো অনুষ্ঠান। শ্বশুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। দোয়া চাইলাম। প্রিয়তমাকে নিয়ে ঢাকায় ফিরলাম।

চতুর্থ পর্বে এসে বলতে হয়, তার দিকে মোটামুটি সামলানো গেছে। এখন আমার পালা। তিন সপ্তাহ পর রাজশাহী গেলাম একা। মাকে খবরটা বলায় মা তার বাক্স গোছাতে ব্যস্ত হলো।

বললো, *এ বাড়ির রিজিক আমার শেষ, বাপের বাড়ি চললাম। তুমি তোমার বাবাকে সামলাও।*

দ্বিতীয় দিন আব্বা বললেন, লিবিয়া যাওয়ার আগেই তোমার বিয়েটা সারতে চাই। অফিসে টেলিগ্রাম করে ছুটি বাড়াও।

আব্বা মেজাজি মানুষ। সাহস যোগাড় করে আব্বাকে বললাম, *আব্বা মাফ করবেন, আমি গত মাসে বিয়ে করে ফেলেছি।*

কোথায়?

সিলেটে।

আব্বা চুপচাপ উঠে গেলেন। পরের দিন বললেন, তোমার বিয়ে মেনে নিতে পারি এই শর্তে যে ভবিষ্যতে সব কিছু তোমাকেই ম্যানেজ করতে হবে।

দোয়া চাইলাম।

পরের পর্ব। পরের মাসে এটমিক এনার্জি কমিশন থেকে পদত্যাগ করে লিবিয়ায় চলে গেলাম। সেটা ১৯৭৮ সাল। সরকারি চাকরি, বেতন ফিক্সড হতে সমস্যা হচ্ছে। তাই ফাইনাল চুক্তি হচ্ছে না, বেতনও হচ্ছে না।

দিন যায় মাস যায়। প্রায় প্রতি দিনই প্রিয়তমার লম্বা চিঠিতে জর্জরিত হচ্ছি, মানিক, তুমি কাছে নাও শিগগিরই।

অনেক চেষ্টা করে, বিশেষ ভিসা বের করে, দিনার ধার করে, পিআইএ থেকে পিটিএ পাঠালাম। পাচ মাস চলে গেল। সে ট্রিপলিতে এলো দেড় মাস পর। তারপর সাত মাস চললো আমাদের হানিমুন লিবিয়াতে।

অনুন্নত সমাজে, বিশেষ করে সাহারা মরুভূমির মাঝে চাকরি ভালো লাগলো না। বছর শেষ করে দেশে ফিরে এলাম। তিন মাস পর এলো আমাদের প্রথম সন্তান। এর এক বছর তিন মাস পর রাজশাহী গেলাম। বাবা-মাকে বৌ ও ছেলে দেখাতে এক সঙ্গে।

বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন সকলেই খুশি হলেন সুন্দরী বৌ দেখে। আব্বা বেশি খুশি আমাদের ছেলে *রেজাকে* পেয়ে। এটা তার রাজাভাই। নিয়তির ইশারা, জীবন চাকা গড়িয়ে চলে। এবার পালা-বদলের পালা।

১৯৮০ সাল ঢাকায় ক্যাটারপিলার ডিলারে সারভিস ম্যানেজারের চাকরি করছি। এতো ভালো বেতন তবু সংসার, বৌ, বাচ্চা, বাসা, গাড়ি, ড্রাইভার দিয়ে প্রতি মাসেই বাজেট ফেল হচ্ছে। প্রতি মাসেই ব্যাংক থেকে গচ্ছিত টাকা তুলছি। এটা জেনে বাবা আমাকে বকা দিলেন।

আমিও বাপকা বেটা। ঢাকা ফিরে পদত্যাগ করলাম। উদ্দেশ্য আবার বিদেশে পালাবো।

সউদি ইলেকট্রিসিটি মন্ত্রণালয়ের টিম ভীষণ খুশি হলো আমার ইন্টারভিউ নিয়ে। দুই মাসের মধ্যে, তালিকার টপ হয়ে নির্বাচিত হলাম।

গত পচিশ বছর এদেশে। বারো বছর মদিনা মনোয়ারায়, তেরো বছর জেদ্দায়। বর্তমানে সউদি ইলেকট্রিসিটি জেদ্দার মেইন অফিসে প্রজেক্ট ডিভিশনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

আমার তিন ছেলে। মেয়ে নেই। মেজ ও ছোটটার মদিনায় জন্ম। বড়টা ঢাকায় কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে এখন মালয়শিয়াতে এমবিএ করেছে। মেজ ও ছোটটা মালয়শিয়াতে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং করছে।

তিন ছেলে কুয়ালা লামপুরে মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটিতে। আমার ও স্ত্রীর মালয়শিয়াতে *গৃন কার্ড* হয়েছে।

মেঘে মেঘে অনেক বেলা হলো। রিটায়ারমেন্টের কাছাকাছি এসে গেছি।

তিন ছেলের জন্য ঢাকায় তিনটা বাড়ি ও আলাদা আলাদা প্লট হয়েছে। এখানে আমার বেতন দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকার ওপরে। ১৯৯৯ মডেলের ই দুইশ চল্লিশ মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি চালাই। আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সবই ঘুরলাম।

অনেকে বলেন, আমার জীবন সফল। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অপ্রাপ্তির ছায়া রয়েই গেল। আজ সেই দুঃখের কথাই বলবো, তাই এই লেখা।

আজ প্রায় পনেরো বছর হলো শ্বশুর মারা গেছেন। এখন আমরা মদিনায়। শাশুড়ি বেচে আছেন। তবে রক্তচাপে কষ্ট পাচ্ছেন। আব্বা ছিয়ানব্বই বছর বয়সে জুলাই ২০০৪-এ মারা গেলেন। মা প্রায় আশি বছর, তবে ওই রক্তচাপ। দুইবার হাসপাতালে নিতে হয়েছিল।

কিন্তু আসল কথা হলো, আজ পর্যন্ত আব্বা-মায়ের সঙ্গে আমার শশুর-শাশুড়ির কখনো দেখা হয়নি গত আটাশ বছরে। কোনো নাটক সিনেমাতেও এমন কখনো দেখিনি। কেন হয়নি? কোনো কৈফিয়ত খুজে পাই না নিজের কাছে।

বলতে পারেন, কাকরাইলে সার্কিট হাউস রোডে আমার বাসা (বেইলি রোডের পাশের রোডে), তাদের একবার একত্র করলেও তো পারতেন। কথা সত্য, শুধু থিওরেটিকাল নয়, বাস্তবেও সম্ভব ছিল। কিন্তু নিয়তি হয়তো তা চায়নি, তাই তা হয়ে ওঠেনি আজও।

ভালো পরিকল্পনা ও ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার এতো সুখ্যাতি, অনেক পাওয়ার স্টেশন পরিকল্পনা ও ডিজাইন করলাম। কিন্তু দেখুন, প্রদীপের নিচটাই অন্ধকার। নিজের ওপর পরিকল্পনা খাটেনি।

মা ও শাশুড়ি এখনো বেচে আছেন। জানি না কোনোদিন তাদের দেখা হবে কি না।

আমার একমাত্র শ্যালক, বছর আঠারো। আগে একবার আমাদের দেশের বাড়ি বেড়িয়ে এসেছে। আর আমরা শুধু জেদ্দা-ঢাকা-সিলেট-ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা-জেদ্দা শাটল করে ফিরছি। ইদানীং ঢাকা-কুয়ালা লামপুর-ঢাকা যোগ হয়েছে। বিচিত্র মানুষের এ জীবন।

বড় ছেলের বিয়ে দেবো শিগগিরই মনে করছি, ছেলেকেও বলেছি। দেখি যদি নাতির বিয়েতে তাদের আনা যায়, দেখা করানো যায়। *সংসারটা হয়তো সঙ সাজাই সার।*

দোয়া করবেন আমাদের সকলের জন্য।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে সকলের জন্য ভালোবাসা।

সউদি ইলেকট্রসিটি, জেদ্দা থেকে
jamal_da@yahoo.com

বর্ষপূর্তি

-লক্ষ্মী

আজ রোমানের সঙ্গে আমার দেখার কাটায় কাটায় এক বছর পূর্ণ হলো। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫-এ আমাদের প্রথম দেখা।

সেল ফোনের বদৌলতে প্রথম কথা হয় রোমানের সঙ্গে। মাধ্যম ছিল আমার ভাসুর ডা. রফিকুল হায়দার। রোমানও এই ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছে ২০০০ সালের প্রথমে। আমি ভর্তি হই ২০০১ সালে। দুজন দুজনকে দেখিনি এর আগে। আমার ভাসুর ছিলেন এই ইউনিভার্সিটির মেডিকালের ডাক্তার। সেই সুবাদে ভাসুরের সঙ্গে পরিচয়।

তিনি আবার আমাকে বোন বলে ডেকেছিলেন। দুষ্টামির ছলে একদিন আমার ভাসুরই বলেছিলেন, তোকে আমাদের ঘরের বৌ বানাবো। তিনিই একদিন আমাকে কথাছলে বলেন রোমানের কথা এবং ফোন নাম্বার দিয়ে বলেন, এই নাম্বার থেকে ফোন এলে যেন কথা বলি। আমার মধ্যে কোনো সিরিয়াসনেস ছিল না। ভাবলাম ফোন করলে নির্ঘাত ফাজলামো করে রেখে দেবো। বেশ কয়দিন কেটে গেল, কোনো ফোন এলো না। আমিও ব্যাপারটি ভুলে গেলাম।

একদিন শামসুন্নাহার হলে গেলাম আমার বান্ধবীর রুমে। আমি ওই হলে গেলে জমজমাট আড্ডা হয়। সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডার বিষয় ছিল হলের ফিস্ট। কে কি পরবো সারা দিন কি কি করবো ইত্যাদি। এমন সময় এলো রোমানের ফোন। নাম্বার দেখেই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এমন ভাব করলাম যেন চিনি না। ওর কথা শুনে বেশ ভালোই লাগলো। ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বর। প্রথম দিনই অনেক কথা হলো। তখন ছিল জানুয়ারি মাস। তার এক সপ্তাহ পরেই আমাদের প্রীতিলতা এবং শামসুন্নাহার হলের বার্ষিক ভোজ।

মোবাইলে আরো চার-পাচ দিন কথা হলো রোমানের সঙ্গে। ফিস্টে শাড়ি পরলাম। সব বান্ধবী মিলে ঘুরলাম। রোমান একটু পর পর ফোন করে খোজ নিচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, আমাকে দেখতে কেমন লাগছে সব জিজ্ঞাসা করলো। বেশ মজা পাচ্ছিলাম ওর কথায়। রাতে হলের কালচারাল প্রোগ্রামে গান গাইলাম। মোবাইলে ও গান শুনলো। এভাবে দিন যেতে লাগলো।

রোজ প্রতিদিনই ফোনে কথা হতো পাচ–ছয়বার করে। রোমান ছিল একটি আবেগপ্রবণ ছেলে। দেখতে দেখতে এক মাস শেষ হয়ে গেল। সেও পাগলের মতো হয়ে গেল আমাকে দেখার জন্য। দেখার আগেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমাকে বিয়ে করার। অবশেষে ঠিক করলো আমাকে দেখতে চিটাগাং আসবে। আমাকে দেখার আগেই সে তার সিদ্ধান্তের কথা আমাকে জানালো।

কিন্তু আমি কঠোরভাবে নিষেধ করলাম। কারণ, আমার ধারণা ছিল সে হয়তো আমাকে দেখে পছন্দ করবে না।

যা হোক। সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঠিক হলো সে আসবে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসার দিনে তার ভ্যালেন্টাইনকে দেখার জন্য। আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে ১৩ তারিখ রাতে চট্টগ্রাম এসে পৌছালো এবং আমাকে ফোন করলো। কথা হলো সকাল আটটায় জিইসি মোড়ে ব্লুবেল–এর সামনে আমাদের দেখা হবে। রোমান বলেছিল কি কালার শার্ট পরবে। সে সারা রাত ছটফট করেই কাটালো আমাকে দেখার অধীর অপেক্ষায়। তার ধৈর্যের বাধ মানছিল না। আটটা বাজার অনেক আগেই সে হাজির। আমি তখনো ঘুমে। তার ফোনে ঘুম ভাঙলো।

আমি বললাম, আসছি। রেডি হয়ে শহরে যেতেই আমার লাগবে এক থেকে দেড় ঘণ্টা। কারণ, আমাদের ক্যাম্পাস থেকে শহর বেশ দূরে। একটু পরেই ও ফোন করলো ক্যাম্পাসে আসছে। হলের সামনে আসবে, আমি যাতে বের হই। হাতে একটি প্যাকেট নিয়ে বের হলাম। যার মধ্যে একটি ডায়রি ও ফতুয়া ছিল। তার জন্য নিজের হাতে ব্লক করেছিলাম ফতুয়ায়। সে একটি হলুদ ট্যাকসি ক্যাবে চড়ে এলো।

তার আগে বলে নিই আমার পরিচয় গোপন রেখে তার কাছে নিজেকে অন্যভাবে উপস্থিত করেছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম আমার প্রতি তার ফিলিংসটা কতোটুকু। আমি তার হলুদ ক্যাবের কাছে গেলাম। সে দরজা খুলে দিল। প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে বললাম, লক্ষ্মী বলেছে সে আসবে না। আপনার জন্য এই প্যাকেটটি দিল। কথাটা শুনে রোমানের চেহারা পুরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যেন এই মুহূর্তে সমস্ত মেঘ এসে তাকে ঘিরে ধরলো। তার দুচোখে পানি টলমল তখন।

কি জানি কি ভেবে বললো, লক্ষ্মী আসেনি তাতে কি? আপনি আসেন আমার সঙ্গে। আজ আপনার সঙ্গেই ডেট করি। আমি আর থাকতে না পেরে হেসে দিলাম এবং চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি শহরের দিকে রওনা দিল। রোমান বরাবরের মতো জানতে চাইলো তাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি না?

হ্যা বা না কিছুই বললাম না। শহরের একটা রেস্টুরেন্টে নাশতা করে *ফয়'স লেকে* গেলাম। পুরো লেক ঘুরে এসে এক পাহাড়ের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। কথা হলো খুব কম। সে বলছিল আমি শুনছিলাম। দুজনের মাঝখানে আমার ব্যাগ দিয়ে রাখলাম। মনে মনে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিলাম এবং আল্লাহকে ডাকছিলাম। কারণ এই প্রথম কোনো ছেলের সঙ্গে বাইরে যাওয়া। দোয়া দরুদ যতো জানি সব পড়লাম। বিকালের দিকে ক্যাম্পাসে গেলাম। হাটতে হাটতে ল' ফ্যাকাল্টির দিকে গেলাম। ওদিকটা তখন সোনালু আর কৃষ্ণচূড়া ফুলে ছেয়ে গেছে। গিয়ে বসলাম ঝুপড়িতে। সে আমার কাছে জানতে চাইলো আমার সিদ্ধান্তের কথা।

বললাম, মা–বাবার অমতে কিছুই করতে পারবো না। সে খুব রাগ করলো। বললো তা হলে কেন এতো কিছু? কেন এতো ছুটে আসা? চলে যাই, বলেই হাটা দিল।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। কি বলবো, কি করবো, কি করা উচিত, কিছুই মাথায় আসছিল না। পরে অনেক কষ্টে তাকে ধরে এনে বসালাম এবং বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো বাবা–মাকে ম্যানেজ করার জন্য। তুমি আমার ফ্যামিলিতে প্রপোজাল দাও।

সন্ধ্যায় সে চলে গেল। বুকের ভেতর কেবলই হাহাকার, চারদিক শূন্য মনে হচ্ছিল তখন। অনেকটা উড়ে এসে জুড়ে বসলো। মন নামে কুঠরিতে সবটুকু জায়গা দখল করে নিল। উপলব্ধি করলাম সত্যিকার অর্থে ভালোবেসে ফেলেছি। তার মতো করে এর আগে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি। অনেকে প্রপোজ করেছে তার মতো করে কেউ চায়নি। সে চলে যাওয়ার পর থেকে খুব একা লাগে। এর মধ্যে আমাদের

অ্যাফেয়ারের ব্যাপারটা পুরো বন্ধু মহলে ছড়িয়ে গেছে। যারা তাকে দেখেছে তারাই তাকে সমর্থন দিয়েছে। তাকে পছন্দ করেছে।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল। প্রতিমাসে একবার আমাদের দেখা হতো। আমাদের ডেটিং স্পট ছিল ফয়'স লেক। সকালে ফয়'স লেক ঘুরে চলে আসতাম ক্যাম্পাসে। এভাবেই দেখতে দেখতে আরো একটা মাস কেটে গেল। এপৃল এলো এবং নিয়ম অনুযায়ী এক মাসের মাথায় আমাদের আবার দেখা হবে।

এপৃলের ১০ তারিখ রোমানের জন্মদিন। তার জন্য নিজের হাতে একটি গেঞ্জি ব্লক করলাম এবং শার্ট কিনলাম অনেক ঘুরে। তার পছন্দ হয় কি না, তাকে মানাবে কি না। বরাবরই সে ঢাকা থেকে আসে ট্রেনে এবং আমি রিসিভ করি স্টেশনে। স্টেশনে যাওয়ার পথে নার্সারি থেকে কিনলাম তার পছন্দের গোলাপ এবং রজনীগন্ধা।

তাকে উইশ করলাম। সেদিন তাকে এতো বেশি ভালো লেগেছিল যে বলে বোঝানো যাবে না। তার পরনে ছিল কালো গেঞ্জি। তারপর আমরা গেলাম আমাদের ডেটিং প্লেসে। লেকের ডান দিকটার উচু পাহাড়ে গিয়ে দাড়ালাম। আর তখনই শুরু হলো ঝুম বৃষ্টি। ছাতা ছিল দুজনের একটি। অগত্যা উপায় না দেখে এক ছাতার নিচে দাড়ালাম বৃষ্টি থেকে বাচার জন্য। সেদিনের সেই বৃষ্টি আমাদের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিল। সে বৃষ্টিকে সাধুবাদ জানালো। বৃষ্টি থামলে দুজনে নিচে নেমে এলাম। লেকের পানিতে একটা ভাসমান রেস্টুরেন্ট আছে, সেটার ওপর গিয়ে বসলাম। আবার শুরু হলো বৈরী বরিষণ। আমরা কাবাব এবং পরোটা খেলাম। প্রায় তিন ঘণ্টার মতো ছিলাম ওখানে। একটি ছেলে বড়শি দিয়ে মাছ ধরছিল ওখানে। অপূর্ব সে দৃশ্য! বাতাসের তাণ্ডবে রেস্টুরেন্টটি দোল খাচ্ছিল।

আমরা একে অপরের খুব কাছাকাছি হাত ধরে বসে ছিলাম। সেকি অনুভূতি, বলে বোঝানো যাবে না। মনে হচ্ছিল আমরা স্বর্গের দেব-দেবী। কোনো কলুষতা আমাদের কখনো ছোবে না। অন্য এক ভালো লাগা ছুয়ে গেল আমাদের। তার জন্মদিনে তাকে আমি নতুন করে পেলাম। কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে না কলিকালে এতো পবিত্র প্রেম। জানুয়ারিতে প্রথম কথা, ফেব্রুয়ারিতে দেখা এবং জুলাই মাসে বিয়ে। অনেক চড়াইউতরাই পার হয়ে দুই পরিবারকে রাজি করাতে পেরেছি আমরা।

আমাদের পবিত্র ভালোবাসার জয় হয়েছে। আমার সত্তাজুড়ে আছে আমার লাইফ পার্টনার। আমার পবিত্র ভালোবাসা। আমার স্বামী। সে আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে। তার ভালোবাসার কাছে আমাকে হার মানতে হয়। আমাদের দেশে মেয়েদের বড় ভয় শ্বশুর-শাশুড়ি। কিন্তু আমার জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে স্নেহধন্য স্থান আমার শ্বশুরবাড়ি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে খুব স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। আমি তাদের ছোট ছেলের বৌ। আমি সুখী তাদের মতো দুটি স্নেহপ্রবণ মানুষ পেয়ে। এখন মনে হয় আমার শ্বশুর-শাশুড়ির ভালোবাসা আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। একটা মেয়ের জন্য আর কি লাগে। কয়টা বৌ পায় শ্বশুর-শাশুড়ির এতো আদর? এতো ভালোবাসা? আমার নারীজন্ম সার্থক।

আমরা একে অপরের প্রতি অনেক বেশি বিশ্বাসী। আমার স্বামী অনেক ভালো। সে আমাকে আমার মতো করে বোঝে যা পৃথিবীর আর কেউ বোঝে না। অনেক হেল্পফুল ছেলে রোমান। এটা কোনো গল্প নয়। এটা আমার জীবনের বাস্তব ঘটনা।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

সবই বিয়োগ

আমার ভালোবাসাটার শুরু বহু দূরের এক অদেখা মানুষকে দিয়ে যাকে কখনোই দেখিনি। ২৪ এপৃল ২০০৩ থেকে পত্র মিতালীর মাধ্যমে বন্ধুত্ব শুরু হয় আমাদের।

আমার ফ্যামিলিতে কেউ তাকে পছন্দ করতো না। এ কথা জেনে পালিয়ে বিয়ে করতে চায় সে, যা কোনো ভাবেই আমাকে দিয়ে সম্ভব হয় না। তাই বিয়ে করা হয় না আমাদের। পূর্ণতা পায় না আমাদের প্রেম। তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। ভালোবাসতাম বললে হয়তো ভুল হবে। কারণ আজও তো তাকে ঘৃণা করতে পারি না। একাকী আকাশের দিকে তাকিয়ে এখনো মন বলে ওঠে তুমি কোথায় আছো?

আমাদের প্রেম যখন রীতিমতো চলছে এই সেপ্টেম্বর ২০০৫–এর প্রথম দিকে আমি আমাদের বাড়িতে ছিলাম না। এই সময় মোবাইলে আমার কাছে ফোন করে আমার জেঠাতো ভাই। যার সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে আমার কথা বলা বন্ধ। ফোন করে সে প্রথমে ভাবে আমি নই, আমার বোন, মানে যার বাসায় বেড়াতে গেছি সে। কিন্তু যখন জানতে পারে আমি, বলে কেমন আছিস?

উত্তরে বলি ভালো।

তারপর বাড়িতে কে কেমন আছে, আমি কবে আসবো, কেমন লাগছে সে এলাকা এ রকম নরমাল কথা হয়। শেষে সে বলে কাল ফোনটা তোর কাছে রাখবি। রাত বারোটার পর কথা বলবো। এভাবে পরের রাতে আবার ফোন করে জিজ্ঞাসা করে কেন কথা বলিনি এতোদিন?

বলি, বাড়ি থেকে নিষেধ করেছিল, তুমিও তো বলোনি।

আমার ভাইটার নামের প্রথম দিকটার অর্থ নতুন, ধরে নেয়া যাক তার নামই নতুন।

তো নতুন ভাই বললো, আমি কথা বললে তুই বলতি?

আমি চুপ করে থাকি। কারণ ও কথা বললেও হয়তো আমিই বলতাম না। ইতিমধ্যে ওকে ঘিরে আমার জীবনে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। সবার ধারণা, তাই কথা বলা বন্ধ। যাক যা বলছিলাম।

নতুন ভাই বললো, এতোটা দিন কতো কষ্টে ছিলাম জানিস। তোকে ভালোবাসি, তুই বুঝতে চাস না কেন? তোকে ছাড়া ওফ আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না।

অনেক কথা হয় নতুন ভাইয়ের সঙ্গে। আমি শুধুই না করি। এ সময় নতুন ভাই প্রশ্ন করে আমি কাউকে পছন্দ করি কি না? বলি, আমার ভালোবাসার মানুষের কথা। কিন্তু সে কোনো কথা শুনতে রাজি হয় না। তার এক কথা, ছোটকাল থেকেই ও আমাকে ভালোবাসে। তার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমাকে অন্য কারো হতে দেবে না। প্রয়োজনে আমায় গুলি করে মারবে এবং নিজে মরবে।

বলি, তুমি তো আমায় কখনো বলোনি। এখন কি বলবো মাসুদকে। যখন আমি দ্বিধা দন্দ্বে ভুগছি এ রকমই একটি সময় নতুন ভাই নেশা করে আমার কাছে ফোন করে। কারণ জানতে চাইলে বলে তোর জন্যই তো নেশা করি। তুই বললে আর করবো না। তুই যা বলবি আমি তাই শুনবো। ভালো হতে চাই, তুই আমাকে ভালো হওয়ার একটা সুযোগ দে।

তার আকুল আবেদনের কাছে না করতে পারি না। রাজি হয়ে যাই তার কথায়। একদিকে আমার ভাই, তার জীবন। অন্যদিকে আমার ভালোবাসা, আমি হেরে যাই। আমার বিবেকের কাছে, অনুভব করি নিজের ভেতর নতুন ভাইয়ের অস্তিত্বকে। যতোই ভালোবাসি অন্য কাউকে তারপরও হৃদয়ের কোনো এক কোণায় সে বিরাজ করতো যা কখনোই বুঝতে পারিনি। শুরু হয়ে যায় আমার নতুন প্রেম, নতুন ভালোবাসা। অনুভব করি, আমি মাসুদের চেয়ে দ্বিগুণ ভালোবাসি নতুন ভাইকে।

ছোটকাল থেকেই নতুন ভাইয়ের ভালোবাসার ছায়ায় বড় হয়েছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে পেয়েছি খুব কাছে থেকে। আর মাসুদ? যাকে কখনো দেখিনি। ভাবি থাক না, অদেখা মানুষটি না হয় অদেখাই থেকে যাক। নতুন ভাই আমাকে বাড়ি আসার জন্য তাড়া দিতে থাকে। আমাকে নাকি তার খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। বলি, বাড়ি গেলেও তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। সে বলে মুখে না বললেও চলবে। চোখ দিয়ে কথা বলবি। এক সময় চলে আসি বাড়িতে। দেখা হয় আমাদের, কথা হয় চুপিসারে। এগিয়ে যায় প্রেম ভালোবাসা। আমি খুব অভিমানী মেয়ে। মাঝে মধ্যেই অভিমান করতাম ওর সঙ্গে। আমার লক্ষ্মী ভাইটা আমার রাগ ভাঙাতো আদর করে, জানতে চাইতো কি হয়েছে? বলতাম না আমি।

এরই মাঝে নতুন ভাই একদিন মোবাইলে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলে। সহ্য করতে পারি না। খুব খারাপ ব্যবহার করি তার সঙ্গে। সে বুঝতেও পারে না কেন এমন করছি। খুব কষ্ট পায় সে। তাকে কষ্ট দিয়ে সেদিনই প্রথম ভালোবাসার জন্য কেঁদেছি। কাদতে কাদতে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি এবং শুনতে পাই পাশের ঘরে তার জেগে থাকার আওয়াজ। টেনশনে তার প্রেশার বেড়ে গেছে এবং জ্বর এসে গেছে। খুব খারাপ লাগে তখন।

পরদিন তাকে খুব অসহায় লাগে। তার দিকে তাকিয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। ঘরে গিয়ে কেটে ফেলি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল। বিকালে ওর কথা মনে করে যখন খুব কাদছিলাম তখনই সে প্রবেশ করে আমার ঘরে। তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমি ঝাপিয়ে পড়ি তার বুকে। তার বুকে মাথা রেখে অনেক কাদি। তারপর এক সময় আবার ঠিক হয়ে যায় আমাদের সম্পর্ক। জানতে পারি যে মেয়েটিকে নিয়ে এতো কিছু সে নতুন ভাইকে বড় ভাই ডাকে। আমার ভুল ভেঙে যায়। নতুন ভাই হয়তো আমাকে খুবই ভালোবাসে। সে রেগে গেলে আমার খুব মজা লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে যখন আমায় আদর করে মিষ্টি করে ডাকে। এতো কিছুর পরও তার সঙ্গে খুব দুষ্টুমি করি। সে যেটা বলবে ঠিক তার উল্টোটা করব। কাছে ডাকলে দূরে যাই। জানি না কেন এমন করি।

আমি তাকে ভালোবাসি। জীবনসঙ্গী করে পাবো কি না জানি না। কারণ এতো কাছাকাছি একই বাড়িতে হয়তো আমায় বিয়ে নাও দিতে পারে। তাই আমার জীবনে বাইরে তাকে সবার সামনে অস্বীকার করে ঘরে গিয়ে আত্মহত্যা করা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আজও আমার জীবনে মনে হয় যোগ বলে কিছুই নেই, সবই বিয়োগ, সবই ভুল।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

হারানো দিন

–আরিফ আহমেদ

অনেক আগে বাবু মামার দরজায় একটা কার্টুন স্টিকার লাগানো ছিল – *গাছের পাতা নড়েচড়ে, ওনার কথা মনে পড়ে।*

এখন আছে কি না বলতে পারছি না। বাবু মামাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে হবে। না থাকারই কথা। বাবু মামা এখন বিবাহিত, তখন ছিল কুমার। আজো জানা হয়নি উনিটা কে?

নাঈম। এখন জার্মানিতে আছে। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের গোত্রছাড়া হয়ে যাবে। সে এখন যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে ফ্যামিলি নির্বাচিত। ক্লাস এইটে পড়ার সময় সেজুতির সঙ্গে প্রেম হয়। সেজুতি সে সময় সিক্সে ছিল। নাঈমের এসএসসি পাসের আগ পর্যন্ত এই প্রেমটা টিকে ছিল। এটা দুই ফ্যামিলির সবাই জানতো। গ্রামে এটা ছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রেম। এসএসসি পাসের পর নাঈম ঢাকায় চলে আসায় এই প্রেমে ভাটা পড়ে। ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমতে থাকে এবং এক সময় তা থেমে যায়। কাকতালীয় হচ্ছে, যেদিন সেজুতির অন্যত্র বিয়ে হয় সেদিন নাঈম জার্মান সরকারের স্কলারশিপসহ ভিসা পায়। সেদিন ফোন করলে বললো, এখন সেজুতি কিংবা গেদীর (আরেকজন, যাদের বাসায় নাঈমরা এক সময় থাকতো) কথা মনে পড়ে না। চোখের সামনে দিয়ে কতো মিনি স্কার্ট হেটে যায়। দুই দিন পর বিয়ে করবো, এখন পুরনো প্রেমিকার কথা কি আর মনে আসবে?

না আসারই কথা। পুরনোকে তো সবাই ছুড়ে ফেলতে চায়। যে রবীন্দ্রনাথের জন্য বৌদি বিষ খেলো সেই রবীন্দ্রনাথ কি এক সময় নতুন স্ত্রীকে পেয়ে তা ভুলে যাননি! নতুন সব কিছুই কি পুরনোকে পেছনে ঠেলে দেয় না?

আমাদের বন্ধু সার্কেলের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র ছেলে লিটন। পরে অবশ্য নাম হয় ডাইলটন (ডাইলখোর লিটন)। তবে সে যে ডাইল (ফেনসিডিল) খায় তা না। সে কখনো সিগারেটের ধোয়াও পেটে নেয়নি। যা হোক এ বেচারার জীবনে যতো প্রেম এসেছিল সবই চোখে চোখে। কাশেম ডাক্তারের মেয়ে যার নাম জানি

না, আমাদের পাশের বাসার একজন যার নাম ভুলে গেছি। একটু মোটা ছিল বলে আমরা *খালা* বলে সম্বোধন করতাম। আরো কতোজন। এর মধ্যে আমাদের বাসার কাজের মেয়েও ছিল। সবই ছিল নীরব প্রেম। দেখা হতো, চোখাচোখি হতো কিন্তু কথা হতো না। লিটন ভাবতো সবাই তার প্রেমে পড়েছে।

এই নীরব প্রেম এক সময় সরব হলো। রীতা নামের অত্যন্ত স্মার্ট এক মেয়ে আমাদের এই বোকা বন্ধুর প্রেমে পড়ে। এটা অবশ্য ডাইলটনের মুখ থেকে শোনা। আমরা মজা পেয়ে গেলাম। প্রথমদিকে আমরা কতো বুদ্ধি দিতাম। পার্কে নিয়ে যাও, বাদাম খাওয়াও, মধুমিতায় সিনেমা দেখতে যাও, পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়ে যাও, জগাবাবুর (জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি) কলেজে চিপাটিপা তো অভাব নেই। কোথাও এক জায়গায় নিয়ে যাও। এরকম কিছু না করলে প্রেম টিকবে না। তুমি তো আর মেয়েদের চেনো না। মেয়েদের মন স্বয়ং ঈশ্বরই চিনতে পারেন না, তুমি তো তুমিই। এমন ভাব যেন আমাদের জীবনে কতো প্রেম এসেছে আর গেছে।

কিন্তু এদের মধ্যে সে রকম কিছু ঘটতো না। এদের মধ্যে নোট চালাচালিই হতো। এমনকি ফোন করলে পড়াশোনার কথাই হতো। আমরা আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। দীর্ঘ চার বছর এক সঙ্গে থাকার পরও কেউ কাউকে প্রেমের কথা বলছে না। পড়াশোনা শেষ করেছে সেই কবে। এখনো নাকি তাদের প্রেম এক জায়গাতেই ঝুলে আছে। আশ্চর্য! সম্ভবত এটাই প্লেটনিক প্রেম।

আমাদের বন্ধু সার্কেলের ধনী কিন্তু কৃপণ বন্ধু মিঠু। তার আরো একটা নাম আছে। চাপাবাজ মিঠু। এইচএসসিতে পড়ার সময় আমাদের সঙ্গে আরো একজন মিঠু যোগ দেয়। এই মিঠু ছিল মুসলিম। হিন্দু, মুসলিম উভয় ধর্মের দুই মিঠু থাকাতে একজনের নাম *মুসলিম মিঠু* আরেকজনের নাম *হিন্দু মিঠু* হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওদের নাম হয়ে গেল অন্যরকম। মুসলিম মিঠু হলো *মিঠু* আর হিন্দু মিঠু (আমাদের ছোটবেলার বন্ধু) চাপাবাজির কারণে হয়ে গেল *চাপাবাজ মিঠু*। তো এই চাপাবাজ মিঠু অনার্সে পড়ে গেল মুসলিম ধর্মের অনুসারী সোমার পাল্লায়। পড়াশোনা শেষ করে দুজনই ভালো চাকরি করছে, তারপরও তারা বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারছে না শুধু ধর্মের কারণে। সোমার পরিবার উদার মনের হলেও মিঠুর পরিবার গোড়া হিন্দু। ফলে এদের মিলন খুবই কণ্টকাকীর্ণ বোঝাই যায়। সবার উপরে মানুষ সত্য এটা – ধর্মত্ববাদের নিচে পড়ে যাচ্ছে না?

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম প্রেম করেছিল আজিজ। আবার সবচেয়ে দ্রুত ছুটেও যায় তারটা। সে *মটু* নামেই পরিচিত আমাদের কাছে। এই মোটা শরীর নিয়ে কি করে যে একটা *চিকনীর* প্রেমে পড়েছিল আল্লাহই জানেন। পরিচয়ের তৃতীয় দিন দেখি মটুর ঠোটে কামড়ের দাগ। কি ঘটনা, কি ঘটনা? জগাবাবুর পাঠশালায় তো আর অন্ধকার জায়গার অভাব নেই। কোনো এক অন্ধকার জায়গায় হয়েছিল ঘটনাটা – *মটুর ঠোটে প্রেমের কামড়*। পঞ্চম দিনে দেখি মটু আমাদের মতো সহজ–জটিল বন্ধুদের ছেড়ে প্রেমের টানে চায়নিজে। দশম দিন থেকে চিকনীর আর কোনো খোজখবর নেই। কি হলো, কি হলো? চৌদ্দতম দিন শুনি চিকনী আমাদের মটুকে ছ্যাকা দিয়েছে অর্থাৎ দুদিন আগে পুরনো প্রেমিক কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করে চিকনী গতকাল চট্টগ্রাম চলে গেছে। *প্রেমের মরা জলে ডুবে না* – এই বাক্য সত্যি হলো। আমাদের মটুর খাওয়া–দাওয়া, ঘুম হারাম হয়ে গেল। মাত্র চৌদ্দ দিনের প্রেমে যে কেউ এতো ভাঙতে পারে, মটুকে দেখার আগে জানা ছিল না।

মুকুলের প্রেমটা ছিল অন্যরকম। প্রেমিকার বাসায় প্রেম। জামাই আদরে মাঝে মাঝেই আপ্যায়িত হতো। কিন্তু যখন বিয়ের ব্যাপার এলো তখন দুই ঢাকাইয়া ফ্যামিলির মধ্যে দেনা–পাওনা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। পরিস্থিতি এমন হলো, মেয়ের বাবা হ্যা বললে তার অপমান আবার ছেলের বাবা হ্যা বললে তার অপমান। দুই ফ্যামিলির অপমান একত্র হয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করলো। মেয়ে রাগ করে একটা *ড্রাগিস্ট* (ড্রাগ এডিক্টেড) ছেলেকে বিয়ে করে ফেললো। ফলস্বরূপ মুকুলের মাথার চুল কমতে কমতে অর্ধেকে নেমে এলো। মাত্র আটাশ বছর বয়সে ফুটবল মাঠের কাছাকাছি। ভাবা যায়, একটা মেয়ের জন্য মাথাকে টাক

মাথা বানিয়ে ফেলছে। টাকার অভাবে *টাকমাথা* হয় কিন্তু প্রেমিকার অভাবে যে *টাকমাথা* হয় এটা জানা ছিল না।

লন্ডনে যেখানে কাজ করি সেখানে আমার কলেজের একজন কাজ করে। হাবিব মামু। প্রথমদিকে মামু ডাকতে ডাকতে সে এখন হাবিব মামু নামে সবার কাছে পরিচিত। এই হাবিব মামুর এক রুমমেট আছে আনোয়ার। চট্টগ্রামের ছেলে। যদিও তার কথায় চট্টগ্রামের টানটা তেমন নেই তবে তার কাণ্ড–কারখানা দেখলে বোঝা যায় চট্টগ্রামের ছেলেরা ছেলেমেয়েদের কি পছন্দ করে। দেশে থাকা অবস্থায় সুমি নামের একজনের সঙ্গে আনোয়ারের গভীর প্রণয় ছিল। লন্ডনে আসার পরও যোগাযোগ ছিল। কিছুদিন আগে বড় ভাইয়ের কাছে ফোন করে শুনলো সুমির বিয়ে ঠিক হয়েছে। ঠিক যেদিন আনোয়ারের ভাইয়ের ফোন এলো তার পরদিন হাবিব মামু দেশে ফোন করে শুনলো তার পুরনো (এখন নেই) প্রণয়িনীর (নাম সম্ভবত পাপিয়া, কারণ হাবিব মামুর প্রেমিকার সংখ্যা আবার কয়েকশ হবে) বিয়ে হয়েছে দুদিন আগে। দুজনেরই দুঃখ প্রায় একই সময়ে শুরু। তবে এদের দুঃখ প্রকাশের ধরন আলাদা। সুপার স্টোর থেকে রাম কিংবা জিনের বোতল নিয়ে আসো, খেয়ে লম্বা ঘুম। তারপরও নাকি মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে – এটা কি হলো... এটা কি হলো...।

এদিকে সুযোগসন্ধানী আমি দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে দুচার পেগ পেটে ঢেলে আসি। কারো গরু মরে আষাঢ় মাসে, কারো ভাগ্য খোলে পৌষ মাসে। ইদানীং আবার বুদ্ধি দিয়ে আসি – *বিলাতি হওয়ার পরও যখন দেশি জিনিস পেলেন না তাহলে এবার শাদা চামড়াই ধরেন*।

দুজনেই খুশি হয় আর আমার পেটে লাল পানির পরিমাণ বাড়ে। চিয়ার্স। জয়তু প্রেমিকা। তাড়াতাড়ি প্রেমিকদের ছ্যাকা দিন, আমার মতো অভাবীদের অভাব পূরণ হোক।

এর মধ্যে যে কোনো মজার ঘটনা ঘটে না তা কিন্তু নয়। আমার এক মামা আছেন। ফারুকমামা। এই মামা আবার অতিমাত্রায় প্রেমিক। যাকে দেখেন তাকেই তার আপন মনে হয়। পাত্রী দেখানোর জন্য একদিন সকাল দশটায় নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। আবার বিকেল পাচটায় মিরপুরে আরেকজনকে দেখার জন্য গেলেন, তাকেও দেখে পছন্দ হয়েছে। যাকে দেখেন তাকেই ভালো লাগে। কাকে রেখে কাকে বিয়ে করবেন এই চিন্তায় এখনো বিয়ে করেননি। ফারুকমামাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তিনি কন্যা রাশির জাতক কি না। তার চেয়ে বড় ব্যাপার ফারুকমামা এরশাদ চাচার সমর্থক। হয়তো দেখা যাবে সত্তর বছর বয়সে বিদিশা চাচির মতো কেউ ফারুকমামার দিশা ঠিক করছে।

আরেকজন আছেন। জাকিরমামা। নতুন বিয়ে করেছেন। কিছুদিন আগে দেখা। কি মামা, বিয়ের পর লাইফ কেমন চলছে?

জিজ্ঞাসা করায় যে উত্তর দিলেন তাতে আমার ভেতর বিয়েভীতি চলে এলো।

বিয়ে শাদি কইরো না ভাইগ্না। যতদিন পারো একলা একলা মচকা মারো।

কেন বিয়ের পর কোন সমস্যা?

তেমন বেশি কিছু না। বিয়ের আগে মার্সিডিজ চালাইতাম এখন চালাই মারুতি।

এই হচ্ছে অবস্থা।

অনেকের কথা তো বললাম, লিখলাম। এবার আমার কথা কিছু বলি। আমি তখন ছয়তলায়... ওফ, রাত তিনটায় আবার কে ফোন করলো? হ্যালো, হাই ডার্লিং। আই অ্যাম কামিং উইদিন ফাইভ মিনিটস।

হেই হেই মার্গা। ওয়েট এ মিনিট। আই অ্যাম নট ফ্র এ্যাট অল নাও। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড কাম টুমরো প্লিজ। অ্যাডভান্স চিয়ার্স ফর টুমরো।

আই এম কামিং নাও, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সি সামবডি ইন ইউর রুম অর নট। বাই।

দূর শালা। লেখার মুডটাই নষ্ট করে দিল। আজকে তোর...।

লন্ডন থেকে

ahmedarif-77@hotmail.com

অনাকাঙ্ক্ষিত

–তাহমিনা আব্বাস ইতি

তখন রাত নয়টা, মাদ্রাজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বসে আছি হাওড়া স্টেশনে। সঙ্গে মালপত্র আর কুলি। সিমেন্টের গোল করে বাধানো একটা স্থানে বসে আছি আর প্রতীক্ষা করছি কখন আসবে আমার সঙ্গের লোকজন। আমার সঙ্গে যারা যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে একজন অসুস্থ ছিলেন আর তাই ধীরে ধীরে তাকে হাটিয়ে আনা হচ্ছিল। এতোবড় স্টেশন, লোকে লোকালয় আর মাঝে মধ্যেই প্ল্যাটফরম কাপিয়ে দমদম শব্দ করে হুইসল ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন আসছে আর যাচ্ছে। একটু কেমন যেন লাগছে। ভ্যাবাচেকা দৃষ্টি মেলে দেখছি আর কতোদূরে আছে সঙ্গের লোকজন। এভাবে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দৃষ্টি পড়লো একজনের ওপর। আবার তাকিয়ে দেখলাম, হ্যা ঠিক, আমার ধারণা একদম ঠিক। মানুষটি আমাকেই দেখছে একেবারে অবাক নয়ন মেলে। কোনো অস্বস্তি বোধ না করেই তার পাশে গিয়ে বসলাম। জানতে চাইলাম, আপনি কি আমায় চেনেন?

বয়সের ভারে নুয়ে পড়া পচাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ মানুষটি আমায় মাথা নেড়ে জানালেন, বাংলা সামাজ নেহি পায়া। জিটিভি, স্টার প্লাস আর সনি টিভির সুবাদে খুব অনায়াসে হিন্দি বোঝা এবং বলার কৌশল আয়ত্তের মধ্যে আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম, আপ মুঝে পাহেচানতি?

উত্তর এলো, নেহি। একটু থেমে আবার বলে উঠলো, আপকা সুরত মেরা বিবিকে তারা।

কথাটা শোনার পর বুকের মধ্যে অজানা একটা কষ্ট অনুভব করতে পারলাম। খেয়াল করে দেখলাম বৃদ্ধ মানুষটির দুচোখের কোণ চিকচিক করছে।

জানতে চাইলাম, আপ কাহা যা রাহা? আপকা সাথ আপকা বিবি কিউ নেহি হে?

একটু হাসলো, তারপর জানালো, আগলি পায়ত্রিশ সালোসে হামারা বিবি হামারা সাথ ভি নেহি হে! ও মুঝে ছোড়কার চালা গায়া। তাবতাক মে একেলা হু। বহুত দিনোসে বাদ তোমকো দেখনে কে পার ও মেরা ইয়াদো মে আয়া।

কথাগুলো বলার পর আর থামতে পারলো না বৃদ্ধ মানুষটি। চোখের জল থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে টিসু পেপার বের করে দিলাম। হাত দিয়ে ইশারা করে জানালো প্রয়োজন নেই। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে নিল চোখ আর চশমার কাচ। দেখতে পেলাম আমার সঙ্গের লোকজন সব চলে এসেছে। আমার তখন ভালো লাগছে কিছুটা। পরিচয় করিয়ে দিলাম বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে একে একে আমার স্বামী, বোন, বোনের স্বামী আর সঙ্গে গাইড হিসেবে যিনি যাচ্ছিলেন।

আধা বাংলা, আধা হিন্দি মিশিয়ে কথা বলে বৃদ্ধ মানুষটির কাছে জানতে পারলাম, তার বাড়ি রাচিতে। সেখানে তার আছে ছোট একটা ফুলের বাগান। সেখানে নাম না জানা অনেক ফুলের গাছ আছে। এসব ফুলের গাছে ফুল ফোটানোর জন্য দরকার হয় যত্নের আর তাই পয়সা দিয়ে রাখা আছে একজন মালী। গাছে যখন ফুল ফোটে মালী তাকে ফোন করে। সে ফিরে যায় রাচিতে তার বাগান দেখার জন্য। তারপর আবার ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়ায় ভারতবর্ষের সবখানে, যখন যেখানে মন চায়। পয়ত্রিশ বছর আগে তার স্ত্রী এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। চলে যাওয়ার আগে সে রেখে গেছে তিনটি পুত্র সন্তান। তার স্ত্রী চলে যাওয়ার সময় তার সন্তানেরা ছিল একেবারে ছোট ছোট। সে স্ত্রীর ভালোবাসা, তার ছোয়া, তার স্মৃতি সবকিছু বুকের মধ্যে আগলে রেখেছে। বড় করেছে তার সন্তানদেরকে। আজ তারা সবাই বিবাহিত এবং প্রতিষ্ঠিত। কোনো সন্তানের কাছেই সে থাকে না। এ জন্য তার সন্তানেরা কষ্ট পায়। কিন্তু সে কষ্ট আর তাকে কষ্ট দেয় না। সে সন্তানদের মায়ার বন্ধন ছেড়ে এভাবে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ পায় আর

যখন বাগানে ফুল ফোটে তখন তার রাচির বাড়িতে ফিরে যায় এবং স্ত্রীর ছবিতে দিয়ে আসে নতুন ফোটা ফুলের মালা। এভাবে সে তার ভালোবাসা তুলে ধরে স্ত্রীর জন্য।

বৃদ্ধ মানুষটির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। তার জীবনে ঘটে যাওয়া নির্মম সত্যের কথা যতো শুনছি ততো কষ্ট পাচ্ছি। ঠিক এই রকম একটা মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আর বেশি সময় নেই। হুইসল দিতে দিতে আমাদেরই ট্রেন আসছে। উঠে দাড়ালাম, বুঝতে পারলো বৃদ্ধ মানুষটিও কি হতে যাচ্ছে। আবারও বলে উঠলো, *আপকা সুরত মেরা বিবিকে তারা*।

আর থামতে পারলাম না সংযত করতে পারলাম না চোখের পানি। ঝড়ে পড়লো দুই ফোটা চোখের জল হাওড়া প্লাটফর্মে। কেউ জানলো না এই ঝরে পড়া চোখের জলের কথা। অসংখ্য মানুষের পায়ের ধুলোয় মুছে গেল ঝরে পড়া সে চোখের জল। এই জল ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত এক ভালোবাসার। যে ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি কখনোই তৈরি ছিলাম না।

ট্রেনে ওঠার আগে ঠিকানা চাইলাম। অনেক কষ্টে মাথা নেড়ে জানালো বৃদ্ধ মানুষটি, *কোই জরুরত নেহি*। আস্তে আস্তে ট্রেন কলকাতা ছেড়ে চেন্নাই-এর উদ্দেশে রওনা হলো। বৃদ্ধ মানুষটিই আমার কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে ছিল, মাদ্রাজের নতুন নাম চেন্নাই।

ট্রেন ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে। জানালার দুধারের দৃশ্য কিছু বোঝার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ক্লান্ত, তাই সবাই নিজ নিজ রিজার্ভেশন সিটে যে যার মতো শুয়ে আছি। আমার সামনের সিটে শুয়ে আছে আমার স্বামী। হঠাৎই মনে হলো বৃদ্ধ মানুষটির কথা, ঠিক আমার স্বামীর কাছাকাছি বয়সেই মানুষটি হারিয়েছিল তার স্ত্রীকে। তারপর থেকে মানুষটি একা একা খুজে ফিরে তার ভালোবাসাকে। ভাবলাম, আমি যদি এখন মারা যাই, হারিয়ে যাই আমার স্বামীর জীবন থেকে ঠিক বৃদ্ধ মানুষটির মতো জীবন হয়ে যাবে আমার স্বামীর, একেবারে একা। ভাবতেই অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতর যন্ত্রণা করে উঠলো। ভালোবাসার কষ্টে সারা শরীর নীল হয়ে এলো। বুঝতে পারলাম আমার কষ্টের কারণ। দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়লো জল। ট্রেন ছুটে চললো আপন গতিতে। পেছনে পড়ে থাকলো আমার জীবনে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার এক ঘটনা।

বেলেপুকুর, চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে

স্যাকৃফাইস

বিশ্বাস করতাম মনের উদারতা, ট্যালেন্ট এবং স্মার্টনেস, ভদ্রতা, নম্রতা দিয়ে সব কিছু জয় করা যায়। সঙ্গে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা তো আছেই। শালীনতা, মার্জিত রুচি, লজ্জা, ধর্মভীরুতা সব মিলিয়ে আমি। উচ্চতায় মোটামুটি, সব মিলিয়ে কারো চেয়ে নিজেকে ছোট মনে করতাম না। মনেই পড়তো না ফর্শা নই কেন? খুব কালো কিংবা মোটামুটি কালো, তাও নই। কম উজ্জ্বল। এতোটুকুই দোষ। সহজে বিশ্বাস করার কারণে বার বার হোচট খাই। আমার বড়ভাইয়া ভাবতো আমি এতো বোকা যে, যদি কোনো রিকশাওয়ালা প্রেম করতে চায়, আমি দয়া করে হ্যা বলে দেবো। এ জন্য আমার শহরে হেটে চলাফেরা করা নিষেধ। আমাকে এ শহরে কেউ কখনো চেনে না।

স্কুলজীবন গার্লস স্কুলে। কলেজ কো-এডুকেশনে বহু যুদ্ধের পর। বয়ফ্রেন্ড, ক্লাসমেট বর্জিত কলেজ জীবন। হঠাৎ পত্রমিতালীর খেলায় মেতেছিলাম কয়েকজন বান্ধবী। লুকিয়ে একজন বিয়ে করে বসলো পত্রমিতালী করেই।

মোবাইলে শব্দ করে কিস করতে পারি না। গলায় ওড়না তুলে রাখতে পারি না। ফিগার শো করতে পারি না। বাস্তবে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসি না বলে প্রেম নাকি টেকেনি। বান্ধবীরা তাই বলে। শুনে হাসি।

আমার অদ্ভুত একটা নাম আছে, মোবাইলে কণ্ঠস্বর শুনে আমার প্রেমে পড়ে ৯৯, ছবি দেখলে ১১০, চিঠিতে ১০০, বাস্তবে দেখলে ১০%, তাও করুণা করে! ছেলেদের সাথে কথা বলা, রক্ষণশীলতার

ভেতরে থেকে চুরি করা সেই প্রথম। হলুদ খামে ভালো লাগা, না লাগা, অজানা অনুভূতি পাঠিয়ে দেয়া সেই প্রথম। কেমন জানি নেশা! এভাবে তার সাথে পরিচয়।

মাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত *মাদার* উপন্যাসের নায়কের নামে তার নাম পাভেল। সে ঢাকা কলেজের ইংরেজিতে এমএ ফাইনাল ইয়ার আর আমি মাত্র এইচএসসি। শুনেছিলাম মা নেই, এতিম সে। এটা শুনেই এতো মায়া জন্মে গেল, মনে হলো এক্ষুণি সব টাকা তার নামে ট্রান্সফার করে দিই। তার প্রত্যেকটি শখ, অস্ট্রেলিয়া যাবার স্বপ্ন সব যেন পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার।

তিন বছর শেষে হঠাৎ সে লিখলো, ভুলে যাও। জর্জ বার্নাডশ, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তার চিন্তাভাবনা চেঞ্জ করে দিয়েছে, তাই প্রেম, বিয়ে কোনোটাই সে করবে না। নব্বই দিন কেঁদেছিলাম কষ্টে। তারপর কড়া শাসনের দেয়াল ডিঙিয়ে এক শীতের সকালে তার শহরে গিয়ে দাড়িয়েছিলাম। আমার মায়া মায়া মুখের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার হাত বাড়িয়েছিল। সেই প্রথম হাত ধরা শিহরণ।

তার শহর ঘোড়াশালের শীতলক্ষ্যা নদীপাড়, নৌকা, ঘোড়াশালের প্রত্যেকটা পথ, ঢাকা শহরের রমনা, শিশুপার্ক, চটপটি, বোটানিকাল গার্ডেন, শাপলা পুকুর পাড়, জাদুঘর, টিএসসি সব যেন আমার আনন্দের সাক্ষীর ভ্যালেন্টাইন গোলাপ। এসব ভুলতে পারিনি এখনো। জীবনের সব উচ্ছ্বাস এখানেই থমকে আছে। তার জন্য পরিবারের টর্চার হয়েছিল। কেন এ রকম মিডল ক্লাস ছেলের জন্য এতো পাগল। বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছি। বড় বড় গার্ডিয়ানদের সামনে দাড়াতে পারি না লজ্জায়। বুঝিনি দূরত্ব, স্পর্শহীন প্রেম তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। যখন বুঝলাম তখন সে অন্য কারো সাথে স্বপ্ন দেখছে। মিথ্যে লিখেছিল ফ্যামিলির অপছন্দ আমার চেহারা। তাই তাকে যেন ভুলে যাই, ক্ষমা করে দেই। দীর্ঘ চারবছর লেগেছিল চেহারা ভালো নয় এটা বুঝতে!

ভেবে অবাক হয়েছিলাম। তার প্রতি ঘৃণা হয় না, ভালোবাসাও না। শুধু মনে হয় এ যুগের সমরেশ পড়া, সুনীল পড়া মেয়ে হয়ে বৃটনির গান শুনি, সেই আমি কেমন করে এ রকম রিলেশনে বিশ্বাসী হলাম? ছেলেদের বেশি ভালোবাসি বলতে নেই, প্রকাশ করতে নেই এটা উপলব্ধি করলাম এবং মন বললো আমি তার ছিলাম না, সে আমার ছিল। রিসেন্টলি ঢাকা গিয়েছিলাম সে সব জায়গায়, গিয়ে উপলব্ধি করতে কতটা স্ট্রং আছে অনুভূতিগুলো।

গিয়ে দেখলাম সব শূন্য, বর্ণহীন, মিথ্যা, ফালতু। সে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে। এয়ারফোর্সের ট্রেনিংয়ে এখন চট্টগ্রামে। খুব বড় হবার স্বপ্ন তার। সুন্দর সঙ্গীর স্বপ্ন দেখে সে। তাই বিরক্ত করিনি বহু দিন, মাস, বছর হলো।

আমার টাকা, ইচ্ছার হাত অনেক লম্বা। তাই প্রতারণার জবাব না দিয়ে স্যাক্রিফাইস নিজেই করলাম। যে পথে সে সুখী হতে চায় হোক না। ক্ষতি যা হবার আমারই হোক। গ্রাজুয়েশন করছি, ইচ্ছা ব্যাংকিংয়ে মাস্টার্স করে ব্যাংকার হবো। স্বপ্ন দেখি কেউ না কেউ একজন অবশ্যই আমার জন্য অপেক্ষায় আছে, যে কালো রঙ দেখবে না। আমার ফিগার শো করা দেখবে না। মোবাইলে কিস করতে বলবে না। আমার সঙ্গে দূরত্ব খুজবে না। তার অপেক্ষায় আছি।

রাতের ঢাকা দেখা আমার শখ। ঢাকায় যে কয়েকটা দিন ছিলাম সন্ধ্যা হলেই তাকে, তার শহরকে প্রচণ্ড ফিল করতাম। অসহনীয় লাগতো। যাদুর মতো টানতো আমাকে। জানতাম সব ভুল। তাই খুব দ্রুত ঢাকা ছাড়লাম।

গতবার শেষ যখন দেখা হয়েছিল তখন যমুনা সেতু পার হবার সময় কেঁদেছিলাম, একা হবার কান্না, ব্যর্থতার কান্না। এবার নতুন স্বপ্ন নিয়ে, নতুন প্রেমের গল্প শুনতে শুনতে পেরিয়ে এলাম। হাসছিলাম করুণভাবে। নিজের প্রতি বড্ড মায়া হলো! মোবাইল, পত্রমিতালীর প্রেম সব ফালতু টাইম পাস বলে।

নিজে কতোটা অন্ধ ছিলাম এটা উপলব্ধি করে ফিরে এলাম। খুব ইচ্ছা ছিল ঢাকায় গিয়ে উইম্পিতে আইসক্রিম খাবো, বলাকা বা মধুমিতায় সিনেমা দেখবো, ফুচকা খাবো, রাস্তার পাশে দাড়িয়ে আমড়া খাবো, রিকশায় উঠবো না। টিএসসিতে আবার যাবো, যেখানে বসে কথা দিয়েছিলো।

সবই করবো ভেবেও করিনি। কেমন জানি লাগলো।

আমার কালো রঙ বলে ঢাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষি, স্বপ্ন বিলাসী মনোভাব, আমাকে কিভাবে ফিরিয়েছে অপমান করে জেনে এলাম। খুব বড় একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে এলাম যা আমাকে সত্যিকার পথ চেনালো। এ জন্য ঢাকা শহর এবং তার মেন্টালিটিকে থ্যাংকস। সেই সঙ্গে আমার প্রথম প্রেমের নায়ককে। এখনো মনে হয় না, কালো বলে আমি পিছিয়ে আছি বা থাকতে হবে।

কালো মেয়ে বলে তার স্বপ্ন দেখা বন্ধ থাকবে কেন?

নাম ঠিকানা বিহীন, জয়পুরহাট থেকে

চিরকুমার

আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে। দিনটি ঠিক মনে নেই। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল। শহর থেকে ইউনিভার্সিটির রোকেয়া হলে রিকশায় আসতে পুরো ভিজে গেলাম।

হলের গেটে কল দেবো এরকম কোনো ছাত্রী নেই। হঠাৎ আমার মতো ভেজা একটি মেয়ে রিকশা থেকে নেমে হলের দিকে দৌড় দিল। আমি তাকে থামিয়ে, আপা একটি কল প্লিজ বলে ছোট কাগজ ধরিয়ে দিলাম।

শ্যামলী, ৪২৯ রোকেয়া হল।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই কোনো কল দিতে পারব না বলে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর সেই মেয়েটি এসে বললো, যে রকম কাকভেজা ভিজেছেন, দিন স্লিপটা, ডেকে দিই এবং ভাগ্যবতী মেয়েটিকে একটু দেখে নিই।

আসলেই শ্যামলী ভাগ্যবতী মেয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর সে এসে আমার অবস্থা দেখে এক দৌড়ে তার রুমে গেল এবং একটি ধোয়া ভাজ করা ওড়না এনে দিল গা মোছার জন্য। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজার ফলে আমি কাপছিলাম।

সে বললো, বৃষ্টিটা থামুক তোমাকে খুব ভালো চা খাওয়াবো।

ওই সময়টাতে ইউনিভার্সিটিতে চায়ের দোকান ছিল অল্প কয়েকটি। প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরির প্রথম পোস্টিং হলো রাজশাহী। সদ্য পাস করা বিধায় তখন কিছু সহপাঠী ছিল, সঙ্গে ছিল নিজ ডিপার্টমেন্টের একদল ছোট ভাই। থার্ড ইয়ারের ছাত্র থাকাকালে সে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। রোকেয়া হলের গেটে আমার এক ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয়।

সেই যে শুরু। মাত্র দুই বছরের মাথায় আমার ঢাকায় পোস্টিং হয়। গত ছয় বছরে এমন কোনো দিন ছিল না তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। রাবি ক্যাম্পাসের এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে আমাদের পা পড়েনি। তখন পদ্মার পাড় ওরকম বাধানো ছিল না। বর্তমান বাধের একটু পশ্চিমে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। মাঝে মাঝেই আমরা প্রায় সারা দিন ওই গাছের ছায়ায় বসে কাটিয়ে দিতাম। সে হল থেকে রান্না করে নিয়ে আসতো দুইজনে খেতাম আর গল্প করতাম।

হঠাৎ একদিন সে বললো, চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি। তুমি তো ভালোই একটা চাকরি করছো।

আমার বাবা-মা গ্রামে থাকতো, ছুটিতে বাড়ি গিয়ে তাদের সব বললাম। তারা রাজি হলেন এবং আমার মা তার বড় বউয়ের বাড়ি আগমনের অপেক্ষায় থাকলেন। রাজশাহী থেকে আমার বাড়ি প্রায় তিনশ' ষাট কিলোমিটার দূর ছিল।

ঢাকা এসে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে গেলাম। দেশে তখন আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও ইয়াহিয়া সরকার প্রহসনের আলোচনা চালাতে লাগলো। ২৫ মার্চের ভয়াল রাত এলো। হিউজ ম্যাসাকার হলো। শুনলাম রাজশাহীতেও অমানবিক অত্যাচার চলেছে ইউনিভার্সিটি হল এবং পুলিশ লাইনে। আমি ২৬ মার্চ বিকালে অফিস থেকে ফিরে আমার বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে দেখা করে রাজশাহী যাওয়ার প্রয়োজনের কথা বললাম। তখন এরকম টেলিযোগাযোগ

ব্যবস্থা ছিল না। আমি এক বন্ধুর মাধ্যমে খবর পাঠালাম সে যেন হল ছাড়ে এবং তার মামার বাসায়, টিচার্স কোয়ার্টারে ওঠে। তার মামা তখন রাবি–র প্রফেসর ছিলেন। চিরকুটে স্পষ্ট উল্লেখ করলাম, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে রাজশাহী পৌছে বিয়ে করে ঢাকায় নিয়ে আসবো। এদিকে ঢাকার অবস্থা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বদলে গেল। আমার বিভাগীয় প্রধানের (পাকিস্তানি) কাছে রাজশাহীর ঘটনা খুলে বলায় হিতে বিপরীত হলো। মার্চ মাসের ৩০ তারিখ বর্তমান পুরনো এয়ারপোর্ট থেকে একটি সামরিক কার্গো প্লেনে ৩০ জন অফিসারের সঙ্গে আমাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দিল। প্লেনে বসে শুনলাম আমাদের সবারই নাম আছে গোয়েন্দা রিপোর্টে। আমরা সবাই স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছিলাম।

তার পরের ঘটনা সবার জানা। পাকিস্তান থেকে মেজর তাহের পালালেন এবং কর্নেল তাহের একটি সেক্টরপ্রধান হলেন। মতিউর একটি ফাইটার নিয়ে পালানোর সময় শহীদ হলেন। পাকিস্তানের মশরুর বিমান ঘাটির কবরস্থানে তার কবর হলো। মতিউরের কবরের উপর লিখে দেয়া হলো : এখানে একজন গাদ্দার শুয়ে আছে। আমরা বেসামরিক অফিসাররা ছটফট করতে থাকলাম স্বাধীনতার অপেক্ষায়। অবশেষে আমাদের বিজয় হলো ১৬ ডিসেম্বর। সেদিনের আনন্দের কথা মনে পড়লে এখনও চোখ ভিজে যায়।

আমি এবং আরো কয়েকজন বাঙালি অফিসার ডিসেম্বরের শেষ দিকে মন্ত্রণালয় থেকে গ্রেফতার হলাম।

বেশ কিছুদিন জেলে থাকার পর দুই দেশের বন্দী বিনিময় চুক্তি হলো। আমার সোনার দেশে ফিরে এলাম। আজও মনে আছে ঢাকায় যেদিন নামলাম, এয়ারপোর্টে হাজার হাজার মা–বাবা, ভাইবোন, তাদের প্রিয় সন্তান, ভাইয়ের অপেক্ষায় ছিল।

আমার জন্য কেউই আসেনি। আমি গ্রামের বাড়ি চলে গেলাম এবং দুই দিন থেকে মাকে সঙ্গে নিয়ে রাজশাহী গেলাম। সারা দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা প্রচণ্ড খারাপ। সব বৃজ ভাঙা, রাজশাহী পৌছাতে চার দিন লাগলো। মা অসুস্থ হয়ে পড়লো, তার পরও তার বড় বৌ দেখার আনন্দে সে অস্থির হয়ে পড়লো। রাজশাহী নেমেই দেখলাম পাক আর্মির অত্যাচারের চিহ্ন। শুনলাম জোহা স্যারসহ কয়েকজন স্যার শহীদ হয়েছেন।

মাকে বন্ধুর বাসায় রেখে আমি আর আমার বন্ধু সেই টিচার্স কোয়ার্টারে তার মামার বাসায় গেলাম। বাসায় তালা দেখে বুক আতকে উঠলো। তার বাড়ির ঠিকানা আমার কাছে ছিল। আমি আর বন্ধুটি একটি ভাঙা নওগার গাড়িতে উঠলাম। সারা দিন লাগলো। পথে কতো রকম কল্পনা – মা বৌয়ের মুখ দেখে কতো খুশি হবে, আমি তাকে দামি শাড়ি গহনা দিতে পারবো না। দেড় বছরের বেশি দিন পরে দেখা, হয়তো অভিমানে কথা বলবে না। কতো কল্পনা করলাম, রাত হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে তাদের বাড়িতে পৌছালাম। আমার শ্যামলী, আমার শ্যামলী, আমার বাংলার শ্যামল প্রান্তর। পাকিস্তানে বসে আমার মা, মাটি ও শ্যামলী এই তিন সত্তা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

পাকিস্তানে বসে এক বন্ধুর চিঠিতে আপেল মাহমুদের একটি গান পেয়েছিলাম। গানটিতে একটি লাইনে ছিল, যে নারীর চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা।... আমার দেহে শ্যামলীর কতো ভালোবাসা। যার জন্য আমি পাকিস্তান বসে প্রতিদিন কতো কল্পনা করেছি। পাকিস্তানে বন্দী অবস্থায় কতো স্বপ্ন দেখতাম। আমার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। আমি খালি হাতে রাজশাহী ফিরে এলাম। আমার আর তার হাতের চা খাওয়া হলো না। আমার দেয়া শাড়ি গহনা তার পরা হলো না।

আমার মায়ের সে কি কান্না। বাবা, আমাদের জন্যই তার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেল। তুই দেশে ছিলি না, আমরা যোগাযোগ করতে পারলাম না। যুদ্ধের মাঝামাঝি তার বিয়ে হয়ে যায় ইউনিভার্সিটির এক লেকচারারের সঙ্গে।

দুই.

১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি প্রধানমন্ত্রীর রাজশাহী সফর উপলক্ষে একজন বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে শহরে অবস্থান করতে হয়। সেই ইউনিভার্সিটির শিক্ষক তখন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির তুখোড় নেতা। প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রামে ওই প্রফেসর সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন।

আমি চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করলাম। রুমাল দিয়ে চশমা মোছার পরও একই অবস্থা।

সে আমাকে দেখলো এবং তার প্রফেসর স্বামীকে কি যেন বলছিল আমাকে ইঙ্গিত করে। প্রোগ্রাম শেষে প্রফেসর আমার কাছে এসে বললেন, আপনি আমার মিসেসের ক্লাসমেট ছিলেন, আপনি চিনতে না পারলেও, সে আপনাকে চিনতে পেরেছে।

এর মধ্যেই সে এসে বললো দেখো তো, আমাকে চিনতে পারো কিনা?

আমার চোখ আরো ঝাপসা হতে থাকলো।

সে জিজ্ঞাসা করলো, আমার কয় বাচ্চা? কোথায় উঠেছি?

রাতে সার্কিট হাউসে সে ফোন করলো এবং তার জীবনের শেষ ইচ্ছা ইউনিভার্সিটির প্যারিস রোড দিয়ে মাত্র সাত-আট মিনিটের জন্য হলেও আমার সঙ্গে পাশাপাশি হাটার কথা জানালো।

আমার হ্যা সূচক উত্তর শুনে ফোন রেখে দিল।

জীবনের শেষ সময়ে এ আমি কি করলাম? সারা রাত ঘুম হলো না। আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগের সব ঘটনা চোখে ভাসতে থাকলো। আমি কষ্ট করে নিজেকে দমন করলাম।

সকালে আমার টিমের বাকি সবাই ঢাকা চলে গেল। কাজ আছে বলে শহরে থেকে গেলাম। হেটে পদ্মার পুব-পশ্চিম পাড়ে ঘণ্টা পাচেক পায়চারি করলাম।

হয়তো সে প্যারিস রোডে অপেক্ষায় ছিল।

আমি যাইনি এই জন্য যে, আমি তার কাছে মিথ্যা বলতে পারতাম না।

কারণ, তোমার বৌ বাচ্চার খবর কি? এই প্রশ্নের উত্তর তাকে (যে এখনো আমার সব) খুবই কষ্ট দিতো।

আমি কখনোই তাকে কষ্ট দিতে চাইনি।

রিটায়ার করেছি কিছুদিন হলো।

এতদিন ড্রাইভার, অফিসের সবাইকে নিয়ে ভালোই ছিলাম। এখন আর সময় কাটে না।

বিয়ে না করে আসলে ভুল করেছিলাম।

কারণ কারো জন্য সময় থেমে থাকে না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

বেহেশত

আমার দুই ছেলে। বড়টার নাম কামরান শাহরিয়ার দীপ, বয়স আট বছর। ছোট ছেলে কাব্য শাহরিয়ার দিগন্ত, বয়স চার বছর। ওদের গল্প খুবই প্রিয়। প্রতিদিন আমাকে দুই তিনটা গল্প বলতেই হয়। ওদের রাক্ষস, ভূত, প্রেত বা আজগুবি ভয়ংকর কোনো গল্প বলি না। এ জন্য যে, ভূত প্রেত সম্বন্ধে একটা ভয় সৃষ্টি হবে ওদের মনে। সে জন্য সব সময় ধর্মীয় এবং শিক্ষামূলক গল্প বলে থাকি যাতে ছোট থেকেই ওদের মনে সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠা পায়। আর মা-বাবা ও বড়দের শ্রদ্ধা করতে শেখে। এবং শুধু সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করতে শিখে।

প্রতিটি মানুষের দুই কাধে ফেরেস্তা থাকে, তারা প্রতি মুহূর্তেই পাপ-পুণ্যের কথা লেখে। এ গল্প খুব ছোট্ট থেকেই ওদের বুঝিয়ে আসছি। এ কারণে ওরা মিথ্যে কথা কখনো বলে না। একদিন বেহেশত ও দোজখের গল্প শোনালাম। পরদিন থেকে দেখি ওরা দুই ভাই আমার পা দুটো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। কে কোন পা নেবে। দুই পা দুই ভাই বুকের ওপর নিয়ে শুয়ে থাকে। আমি শুয়ে পেপার, পত্রিকা পড়ি আর ওরা আমার পায়ের ভীষণ যত্ন করে। নিভিয়া কৃম মাখায়, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখায়, গামছা দিয়ে মুছে

দেয় পরিষ্কার করে। আমি তো মাঝে মধ্যে রেগে যাই। বলি তোমরা আমার পা নিয়ে এরকম করছো কেন? কিন্তু ওরা কিছুই বলে না। পাও ছাড়তে চায় না।

দীপ পড়ে ক্লাস টু-তে। ক্লাসে হাশরের মাঠ পড়ানো হচ্ছে। পড়াটা ওকে বুঝিয়ে দিলাম এবং বললাম ওই হাশরের মাঠেই বিচার করে আল্লাহ মানুষকে দোজখ আর বেহেশতে পাঠিয়ে দেবেন। দীপ তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে আরম্ভ করলো, আম্মু আমি তোমাকে ছাড়া একা একা বেহেশতে যাবো না। আমি তোমার সঙ্গেই বেহেশতে যাবো। ওর কান্না দেখে অবাক হয়ে কি আর বলি, এখন যদি বিস্তারিত বুঝিয়ে বলি তবে হয়তো মনের ওপর চাপ পড়বে, ভয় পাবে। সে জন্য বললাম, ঠিক আছে আমার সঙ্গেই যেও। তারপর দুপুর বেলা হালকা ঘুমের মধ্যে দেখি ওরা দুইভাই আমার পায়ের তলায় বিভিন্ন জায়গায় চাপ দিচ্ছে। খোচা দিয়ে কি যেন খুজছে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, এই তোমরা পায়ের তলায় এরকম করছো কেন, আমার ঘুম ভেঙে গেল। দুই ভাই একসঙ্গে বললো, আমরা বেহেশত খুজছি আম্মু। বেহেশতের গেইটটা কোথায়? সুইচটা কোথায় আম্মু তাই খুজছি। সুইচে চাপ দিলেই কি গেইটটা খুলে বেহেশত দেখা যাবে আম্মু? এ রকম হাজারো প্রশ্ন। মায়ের পায়ের তলায় ওদের বেহেশত, তাই ওরা আমাকে জোরে হাটতেও দিতে চায় না। বাথরুম থেকে এলেই গামছা দিয়ে পা মুছে দেয়। এই হচ্ছে আমার ছেলেরা।

আমার এ লেখা আপনারা যারা পড়বেন আপনারা আমার ছেলেদের জন্য দোয়া করবেন। ওদের যেন সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পুঠিয়া, রাজশাহী থেকে

ফাদ

–ফুল ফারিয়া

একদিন অফিসে বসে বান্ধবীকে মিসকল দিচ্ছিলাম। সেটা যে রং নাম্বারে চলে গেছে তা খেয়াল হল যখন কল ব্যাকে পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। তাকে ঘটনা বুঝিয়ে বললাম এবং সরি বলে লাইন কেটে দিলাম।

পরের দিন আবার সেই ব্যক্তির ফোন এলো। বললো, গত পরশু সে তার মোবাইলটি কিনেছে। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল মোবাইলে প্রথম যে কলটি আসবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে সুন্দর একটি সম্পর্ক গড়বো। তা সে ছেলে-মেয়ে যাই হোক। তোমার দুর্ভাগ্য প্রতিজ্ঞার সেই ফাদে তোমার পা।

সরি, আমি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি না, বলে লাইন কেটে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার ফোন। এবার তাকে খুব ভদ্রভাবে বুঝিয়ে বললাম, দেখুন এভাবে নিজেকে ছোট করবেন না।

কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। প্রতিদিন সে আমাকে ফোন করতে থাকে। আমি মাঝে মধ্যে কল রিসিভ করে মোবাইল টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে বলি, ব্যাটার টাকা কাটা যাক। এমনি একদিন কল রিসিভ করে কথা না বলে শুধু শুনছি পাগলে কি বলে। তিনি বার বার বলছেন, *কথা কন না ক্যান? কথা কন না ক্যান?* তার ভাষা শুনে হেসে ফেলি।

হাসি শুনে তিনি বলে ওঠেন, আপনার হাসিটি বেশ।

বলি, আমার গালিগুলো আরো চমৎকার যা খুব শিগগির আপনার ভাগ্যে আছে।

প্রতিদিন লোকটি আমাকে ফোন করছে। আমি বিরক্ত হয়ে প্রায়ই মোবাইল অফ করে রাখি। যখনই অন করি ঠিক দুই-তিন মিনিটের মধ্যে তার কল এসে যায়। আমি *পাগল* নামে তার নাম্বার আমার মোবাইলে সেভ করে রাখি।

শুধু তার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘ ছয় দিন আমি মোবাইল অফ করে রাখি। ভেবেছি এতোদিনে তার পাগলামি চলে যাবে। কিন্তু সাত দিনের মাথায় যখন মোবাইল অন করি ঠিক দুই-তিন মিনিটের মধ্যে তার

কল আসে। রিং হচ্ছে তো হচ্ছেই, ধরছি না। এভাবে বিশবার, পচিশবার, ত্রিশবার রিং বেজেই চলছে। ভাবি একটা মানুষ এতো পাগল হতে পারে? তার এই পাগলামি এক ঝটকায় যেন আমাকে তার অনেকটা কাছে নিয়ে গেল।

ফোন রিসিভ করে নাম জানতে চাইলাম।

একদমে বলে ফেললো, নাম হীরা, বিবাহিত, এক সন্তানের পিতা, একটা প্রাইভেট ফার্মের ডিরেক্টর।

পরিচয় পর্ব শেষে বিবাহিত শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললাম, বন্ধুত্ব করতে পারি। তবে শর্ত আছে। দেড়টায় ফোন করবেন এবং সেটা সপ্তাহে একদিন।

শর্ত মেনে নিল সে।

পরদিন ঠিক ১টা ২৯ মিনিটে তার ফোন এলো।

কি ব্যাপার, গতকাল না কথা হলো?

গতকাল ছিল গত সপ্তাহ। আজ নতুন সপ্তাহ।

তার কথা শুনে না হেসে পারলাম না। কিসের দেড়টা, কিসের সাত দিন যখন ইচ্ছা সে ফোন করছে। বকলে শুধু হা হা করে হাসতে থাকে। তার এই প্রাণখোলা হাসি আমার ভালো লাগে।

লোকটি মনে হয় সহজ সরল, তা না হলে প্রথম পরিচয়েই এসব ক্ষেত্রে কম মানুষই বিবাহিত বলে পরিচয় দেয়। তবে কথা বলে বেশির ভাগ সময় আঞ্চলিক ভাষায় যা আমার ভালো লাগে না।

বললাম, কথা বার্তায় আপনাকে আরেকটু স্মার্ট হতে হবে।

আজ থেকে আমাকে স্মার্ট বানানোর দায়িত্ব আপনার।

তার কথা শুনে মনে হয় যেন কতো জনমের অধিকার।

আমরা এখন বেশ সময় নিয়ে কথা বলছি। আমি একটা মিসকল দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সে কল ব্যাক করে। ভালোই লাগছে এই বন্ধুত্ব।

অফিসের একটা কাজে আমাকে তিন দিনের জন্য খুলনা যেতে হবে। তাই হীরাকে বললাম, এই তিন দিন যেন আমাকে ফোন না করে।

বললো, ঠিক আছে।

অথচ, এই তিন দিনে সে আমাকে একত্রিশ বার ফোন করেছে। পাগল আর কাকে বলে!

আমরা খুব দ্রুত যেন একে অপরের কাছাকাছি চলে এসেছি। এরই মধ্যে আপনি থেকে তুমি হয়েছি। একে অপরের ছবি দেখেছি। মান-অভিমান করেছি। হীরা আমাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতাও লিখেছে। যা মোবাইলে আমাকে আবৃত্তি করে শোনায়। সত্যি ওর কবিতা লেখার হাত চমৎকার।

হীরা, আমাদের এই সম্পর্ক ভোরের কুয়াশা দিয়ে একদিন ঢেকে যাবে তাই না?

না, সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে আমি তোমাকে খুজে আনবো।

পারবে না।

পারবো, তুমি দেখে নিও।

আমার অপছন্দনীয় ব্যাপারগুলোতে ও খুব সতর্ক থাকে। শুধু আমার জন্য ও সুন্দর করে এবং গুছিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে।

সে বলে, আমি তোমাকে ভয় পাই।

কি রকম?

যেমন কথা বলার সময় কাশি এলেও খুব কষ্টে তা চেপে রাখি শুধু তোমার ভয়ে।

ওর এই সরলতা আমাকে আরো কাছে নিয়ে যায়। আমি ওকে যখনই প্রশ্ন করি, হীরা তুমি এতো ভালো কেন?

ওর একই উত্তর, তুমি ভালো তাই আমিও ভালো।

অধিকাংশ সময়ই আমি তাকে নাম ধরে ডাকি। যেমন হীরা তুমি কোথায়? হীরা কি করছো? হীরা কেমন আছো? এই ডাক শুনে নাকি ওর বুকটা চৌচির হয়ে যায়। এতো সুন্দর করে নাকি কেউ তাকে কোনোদিন ডাকেনি।

ইদানীং হীরা আমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ঠিক হলো আগামী এক মাস পর নির্দিষ্ট একটা বাসস্ট্যান্ডে ও থাকবে। আমি যাবো। ও পরবে আকাশী শার্ট, আমি শাদা সালোয়ার কামিজ। তবে রওনা দেয়ার ঠিক আগে আমি ওকে ফোন করে বলবো, হীরা তুমি রওনা দাও।

শুধু দিন গুণছি কবে এক মাস শেষ হবে। অবশেষে এক যুগ পরে যেন এক মাস হলো। ছুটির দিনে বাইরে গেলে আমি সাধারণত মোবাইল বাসায় রেখে যাই। কারণ বড় ভাইয়ার খবরদারি আমার ভালো লাগে না। কিছুক্ষণ পর পরই ভাইয়া ফোন করে জানতে চায় কোথায় আছি, কি করছি ইত্যাদি। আমাকে নিয়ে বড় ভাইয়ার চিন্তার শেষ নেই। কারণ তিনি তার পছন্দের এক পাত্রকে আমার জন্য নির্বাচন করে রেখেছেন। আর বড় ভাইয়া ভীষণ বদরাগী। তাকে আমি খুব ভয় পাই। তাই আজও মোবাইল বাসায় রেখে গিয়েছি।

হীরার জন্য কিছু গিফট কিনে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে একটা দোকান থেকে ওকে ফোন করলাম। কিন্তু ওর মোবাইল বন্ধ। আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। বিভিন্ন দোকান থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ওকে অন্তত ত্রিশ চল্লিশ বার ফোন করলাম। কোনো কাজ হলো না। প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণায় সিদ্ধান্ত নিলাম আজই সম্পর্ক শেষ।

বাড়ি ফেরার জন্য বাসে উঠবো, ভাবলাম আর একবার চেষ্টা করে দেখি। এক দোকান থেকে আবার ফোন করলাম। অপর প্রান্তে হীরার কণ্ঠ। কেন জানি না আমার চোখ ভিজে উঠলো। অনেক গালি দিলাম তাকে। এমনকি জবাই করে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিলাম। শুনে ফোনের দোকানের ছেলেটি হাসছিল।

কাপা কাপা কণ্ঠে হীরা বললো, তোমার ফোনের আশায় হাতে মোবাইল রাখতে রাখতে হাত ব্যথা করে তারপর সাড়ে বারোটার সময় মোবাইল অফ করে জুমার নামাজ পড়তে চলে যাই। ভেবেছি তুমি আসবে না। পরে মোবাইল অন করতে আর মনে ছিল না।

এতোক্ষণে তাকে দেখার সাধ আমার মিটে গেছে। ওর জন্য কোনো গিফট বাসায় নেয়ারও কোনো উপায় ছিল না। তাই গিফট দেয়ার জন্য ওকে নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ডে আসতে বলে আমি বাসে চড়লাম।

বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি ও আগেই এসে চুপচাপ দাড়িয়ে আছে। আমি খুব বিমর্ষ। প্রচণ্ড অভিমান বোধ থেকে আর বাস থেকে নামলাম না। এক লোকের মাধ্যমে গিফটের ব্যাগটা ওকে ধরিয়ে দিলাম। আমার বাস ছেড়ে দিল। সে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো। রাগ একটু কমাতে আমিও একটু হাসলাম।

হীরা দেখতে বেশ কালো। তবে চেহারাটা মিষ্টি। এক কথায় ব্ল্যাক ডায়মন্ড।

পরদিন ফোনে আগের দিনের ঘটনার জন্য বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলো। বললাম, ছয়মাস কথা না বলে আমি তোমাকে শাস্তি দেবো।

ছয় মাস কেন এক সপ্তাহ কথা না বললেই আমি মরে যাবো। সে বললো।

ওর অপ্রতিরোধ্য মিনতির কাছে আমাকে হার মানতে হলো। কবিতা শোনালো, *ফুলের হাসি,* সত্যি কবিতাটি একসেলেন্ট।

কথার খেলায় আর কবিতার ছন্দে আমরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। শুধু মুখে বলা হয়নি, ভালোবাসি। হীরা আমার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রায়ই অফিসে অন্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলো দেয়। তারপর আমাকে সরি বলতে থাকে। যা আমার কাছে অসহ্য লাগে। এমনি একদিন আমার সঙ্গে কথা বলার সময় অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলছে। আমার মনে হলো ও যেন কাকে *আই লাভ ইউ* বলছে।

কাকে আই লাভ ইউ বললে? প্রশ্ন করলাম।

যে প্রশ্ন করেছে তাকে।

তোমার এতো সাহস? কেন বললে?

একশ বার বলবো, হাজার বার বলবো। আমার জন্মই হয়েছে শুধু তোমাকে আই লাভ ইউ বলার জন্য। যে কথা হয়নি বলা আজ তাও বলা হয়ে গেল।

কই রাগ তো করতে পারলাম না। বরং এ যেন প্রত্যাশিত ছিল।

মাঝে মধ্যে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করি, আমার জন্য ওর সংসারে কোনো আচর লাগবে না তো।

না। তা কোনোদিন লাগতে দেবো না। আমরা একে অপরকে কোনোদিন পেতে চাইবো না। তবে খুব কষ্টভরা কণ্ঠে ও প্রায়ই বলে, জানি তোমাকে কোনোদিনই পাবো না।

হেসে বলি, পেয়েই তো গেছো।

এর মধ্যে একটা ট্রেনিংয়ে গিয়ে আমার মোবাইলটা হারিয়ে ফেলি, তাই মনটা খুব খারাপ। নিশ্চয়ই হীরা ওই নাম্বারে ফোন করবে। ভাইয়ার মোবাইলে তাই হীরাকে ঘটনা জানাই।

মন খারাপ করো না। আমি মোবাইল কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে বললো।

যদি মোবাইল পাঠাও তবে আমাকে হারাবে। বললাম আমি।

ইদানীং আমার চিন্তা, চেতনায় হীরার অবাধ বিচরণ। খুব কষ্ট পাই একদিন ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে। আবার এও ভাবি অমীমাংসিত এ সম্পর্ক আর কতো দূর টেনে নেবো? ভাইয়া জানতে পারলে দুজনকেই খুন করে ফেলবে। লীগের অনেক ক্যাডারদের সঙ্গে ভাইয়ার ওঠাবসা। শুধু ইশারা করলেই হীরা শেষ। তারচেয়ে এই তো সুযোগ ওকে ভুলে যাবার। মোবাইল আর কিনবো না।

কিন্তু ভুলে থাকতে চাইলেই তো আর ভুলে থাকা যায় না। যে কষ্ট হীরাকে দিচ্ছি তার চেয়ে দ্বিগুণ নিজে পাচ্ছি।

না। আর থাকতে পারলাম না। শেষ একুশ দিন পর মোবাইল কিনলাম। হীরাকে ফোন করলাম। কিন্তু ওকে বললাম, এটা আমার মামার মোবাইল। তিনি যুব উন্নয়নে চাকরি করেন। বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। এখন থেকে আমাদের বাসায় থাকবেন। আমি সুযোগ পেলে তোমাকে ফোন করবো।

তুমি মোবাইল কিনছো না কেন? সে জানতে চাইলো।

কিছু ছেলে আমাকে মোবাইলে ডিসটার্ব করতো। যা ভাইয়া জানে। তাই বিয়ের আগ পর্যন্ত ভাইয়া আর আমাকে মোবাইল ব্যবহার করতে দিতে রাজি নয়।

এখন আমি একুশ দিন সাতাশ দিন পর পর হীরাকে ফোন করি। সে শুধু ওর কষ্টের কথা বলে আর ভাইয়াকে বকে।

হীরা ওর কষ্টের কথা আমাকে জানাতে পারে। কিন্তু আমার কষ্টের কথা আমি হীরাকে জানাতে পারি না। বুকের মাঝে হাহাকারের হু হু হাওয়াগুলো খুব কষ্টে দমিয়ে নিজেকে সংযত করি। শুধু হীরাকে ভাইয়ার হাত থেকে বাচাতে। শুধু হীরার সংসার ঠিক রাখতে।

সত্যি–মিথ্যা যখন যা বুঝিয়েছি সে তা–ই বিশ্বাস করেছে। কখনো তা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু সে কখনো আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করেনি।

ওর সততা, সরলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওর প্রাণ উজাড় করা হাসি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। ওর পাগলামি তাকে আমার কাছে টেনেছে।

জানি আমাদের এ ভালোবাসায় চাওয়া–পাওয়ার কিছু নেই। তবুও একে অপরের জন্য হৃদয়ের টান আকাশের মতো বিস্তৃত আর সমুদ্রের মতো গভীর।

আমি ইচ্ছা করেই ওর জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। হয়তো ওর ভালোবাসার শক্তি, ওর কালো চোখের দৃষ্টি আমৃত্যু আমাকে খুজে ফিরবে।

কিশোরগঞ্জ থেকে

কাজলা দিদি

– লিজি পাশা

ছয় বছরের হেলেন যেদিন স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য মৌখিক পরীক্ষা দিতে গেল আমরা দুই বোন ওর ফিরে আসার জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলাম।

সহজ–সরল গোলগাল হেলেন মন খারাপ করা ভাব নিয়ে ফিরে এলো এক সময়। ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? পরীক্ষা কেমন হলো? কি জিজ্ঞাসা করলো রে?

হেলেনের ছোট্ট জবাব, মাস্টার জিজ্ঞাসা করলো মুরগির কয়টা পা।

বললাম, তা তুই কি বললি?

হেলেনের সোজা উত্তর, আমি তো জানি না মুরগির কয় পা তাই উত্তর দিতে পারিনি।

অ্যানি দূর থেকে সব শুনে দৌড়ে এসে হাপাতে হাপাতে বললো হায় হায় মুরগির তিন ঠ্যাং তাও তুই জানিস না?

এই আমাদের সাধারণ ছোটবেলা। তবু যেন প্রতিটি দিন অসাধারণ। সহজ–সরল জটিলতাহীন জীবন। মায়ের স্নেহের ছায়ায় অ্যানি, আমি, হেলেন, ডিউক। বাকি ভাইবোনেরা দূরে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে অ্যানির হুট করে বিয়ে হলে গেল।

আমি মহাখুশি একটা সুন্দর দুলাভাই পেলাম, যদিও লাভ তেমন হলো না দুলাভাইয়ের কৃপণ স্বভাবের কারণে। মাঝে মধ্যে অ্যানি আসে দুলাভাইকে সঙ্গে নিয়ে। কয়দিন খুব আনন্দে কাটে। মা নিজের জানপাত করে নতুন জামাইকে তুষ্ট করতে অসাধারণ সব রান্না করেন। আমরাও ভাগ পাই।

বছরখানেক পর একটা উৎসবমুখর পরিবেশে অ্যানিকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসা হলো। জানতে পারলাম তার বাবু হবে। আগে অ্যানির সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন ঝগড়া হতো। এবার আসার পর দেখলাম ঝগড়াঝাটিতে তার একেবারে উৎসাহ নেই। কোনো অজানা স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। আমি কয়েকবার চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিলাম।

একদিন মাঝরাতে খুব হইচইতে ঘুম ভেঙে গেল।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ভয়ার্ত চোখে দেখলাম অ্যানিকে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে মধ্যে ভীষণ ঝাকুনি দিয়ে উঠছে। আমার ডাক্তার পিতার বিখ্যাত ডাক্তারি ব্যাগটা এই বিপদে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। সারা গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে মাঝরাতে এই বাড়িতে। ক্রমেই হইচই বেড়ে চললো। এক সময় জানলাম অ্যানির *একলামশিয়া* নামের এক মারাত্মক অসুখ হয়েছে।

সকালে ভাইসাহেব এলেন। কুষ্টিয়া শহর খুব দূরে নয়, তবুও চাদে যাওয়ার চেয়ে কঠিন ছিল তখন। অ্যানিকে নিয়ে সবাই চলে গেল। ছোট্ট ডিউকও গেল মায়ের সঙ্গে। সারা দিন আমি আর হেলেন একা। রাতের অন্ধকারে হারিকেন ও হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে অনেক লোকসহ অ্যানি ফিরে এলো। অ্যানিকে আমরা সবাই সেদিন খুব আদর করলাম। কার নির্দেশে আমার ছোট্ট হাতে পরম মমতায় অ্যানির হাত থেকে চুড়িগুলো খুলে খুলে রাখলাম।

সকালে উঠোনে জবা ফুল গাছের নিচে সযত্নে শোয়ানো হলো অ্যানিকে গোসল করানোর জন্য। থোকা থোকা রক্তের মতো লাল জবা সারা রাতের জমানো শিশির বিন্দু দিয়ে সেদিন তাকে সিক্ত করেছিল কি না জানা হয়নি।

প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে একা শুয়ে থাকি। যথানিয়মে সন্ধ্যা নামে। বাশ বাগানের মাথার ওপর চাদ ওঠে। হাহাকার করে চারদিক। একা অঝোরে কাদি। অ্যানির জন্য অন্তহীন ভালোবাসার উপলব্ধি পাগল করে দেয় আমাকে।

এভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যা নামে প্রতিদিন চাদ ওঠে। আমার দুঃখিনী মায়ের কাছে গিয়ে কখনো জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। *মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই?* মাঝখানে চলে গেছে কতো বছর। কতো

হাজার বার চাদ উঠেছে। এসেছে শুক্লপক্ষ এসেছে কৃষ্ণপক্ষ। হিসাব করতে ভালো লাগে না। কোনো কিছুই হিসাব করি না আর।

বাশ বাগানের ছায়ায় যখন মা-বাপকে দেখতে যাই অ্যানিকে খুজি। কিন্তু আমার অভিমানী বোন ধরা দেয় না। কেউ তাকে খুজে পায় না। অথচ সবখানেই আছে সে। যখন মায়ের আলমারি অথবা কাঠের বক্স খুলি অ্যানির লম্বা চুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে ওঠে সব। রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হয়ে জ্বলতে থাকে সে।

এখন বুঝতে পারি ভালোবাসা পেতে অ্যানি খুব ভালোবাসতো। মৃত্যুর পরও যতো ভালোবাসা পেয়েছে হায় তার এক কণা যদি সে বেচে থাকতে পেতো।

ঘুম না আসা রাতে অবুঝ শিশুর মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছা করে –

ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না
একলা জেগে রই
মাগো আমার শোলক বলা
কাজলা দিদি কই?

ঢাকা থেকে
pratikkha@yahoo.com

সুখ

–মিলি

মজা করার জন্যই অভিকে বললাম, কি রে আমার হাত ধরতে তোর ইচ্ছা করে না?

আমি ভেবেছিলাম, ও এর কোনো উত্তর না দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলবে, এর মানে কি?

কারণ পৃথিবী সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞানই নেই। একমাত্র একটা কাজই সে পারে, তা হলো, চশমার ফাক দিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা আর বইয়ের বাইরে কোনো প্রশ্ন করলে চোখ বড় করে বলা, এর মানে কি?

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন সে বললো, হ্যা, ধরতে ইচ্ছা করে।

ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কি ব্যাপার! এ উত্তরের মানে কি?

তখনই সে বললো – তবে সব সময় না। যখন তোদের বাড়িতে গেলে ছাদে উঠতে হয় তখন।

এতোক্ষণে বুঝলাম এই ব্যাপার। আসলে আমাদের বাড়িতে ছাদে ওঠার জন্য আলাদা একটা লোহার সিড়ি আছে। সেটা দিয়ে ছাদে উঠতে গেলে আমারই কেমন যেন ভয় করে আর সে তো ভয় পাবেই। তখন আমার হাত ধরতে চাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক চাওয়া না।

বললাম, আর কখনো হাত ধরতে ইচ্ছা করে না?

সে বললো, কি জানি, এখন মনে পড়ছে না।

আমার খুব ভালো লাগে এই বেকুবটাকে। আমার মনের পুরো জায়গা জুড়ে আছে এই মহা পণ্ডিত বেকুব! আমার বড় ইচ্ছা করে তার হাত ধরে সারাক্ষণ বসে থাকতে। কিন্তু কি করে বোঝাবো। সে কিছুই বুঝতে পারে না।

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে এসে বললো, খুব পিপাসা পেয়েছে, এক গ্লাস পানি দাও তো।

গরমের দিনে পানি এমনিতেই গরম হয়ে থাকে। তাই এক গ্লাস দিলাম।

সে পানিটুকু শেষ করে বললো, পানি একটু কম ঠাণ্ডা ছিল। আরেকটু ঠাণ্ডা হলে ভালো হতো।

এই হলো তার অবস্থা।

আমি যে কতোটা সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি তা বুঝলাম যেদিন আমার সঙ্গে আমার সেই বোকা চাচাতো ভাই অভির বিয়ে ঠিক হলো। কেমন যেন সব কিছু স্বপ্নের মতো ঘটে গেল।

বিয়ের আগে একদিন তাকে বললাম, পণ্ডিত মশাই, এবার যে পড়াশোনা কমাতে হবে।
সে বললো, কেন, এর মানে কি?
বললাম, আমাদের বিয়ের পর তোমার একমাত্র কাজ হবে আমার হাত ধরে বসে থাকা। যদি রাজি থাকো তবেই বিয়ে হবে আর রাজি না থাকলে তোমার বাবাকে গিয়ে বলো আমাকে তুমি বিয়ে করবে না। বলেই আমি চলে এলাম।
আমি জানি সে তখন ব্যাপারটা নিয়ে মহা চিন্তায় পড়েছে। তবে চিন্তা করে কোনো লাভ হয়নি। আমার সঙ্গেই তার বিয়ে হলো শেষ পর্যন্ত। জীবনের কাছে আর আমার কিছুই চাওয়ার নেই।
যখন সে অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বসে, কাগজপত্র সরিয়ে জোর করে আমার হাত ধরিয়ে বসিয়ে রাখি। সে তখন চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।
আমার তখন মনে হয় আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ থেকে

ইমা

১৪ ফেব্রুয়ারি। সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে। এ দিনটির উৎপত্তি, ইতিহাস এ সংখ্যায় নিশ্চয়ই যায়যায়দিন কর্তৃপক্ষ নিবেদন করবেন। আমি ছোট পরিসরে ভালোবাসার একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে চাই। সেটাও হয়তো সুন্দরভাবে কেউ উপস্থাপন করবেন নিঃসন্দেহে।
যে দেশেই দিনটির জন্ম ঘটুক, বাংলাদেশে এর আমদানিকারক যাযাদি। হাটি হাটি পা পা করতে করতে দিনটি বর্তমানে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নানাভাবে আলোচিত ও সমাদৃত, যদিও উচ্চারণগত ত্রুটিমুক্ত হতে পারেনি এখনো।
যাযাবরের বহুল পঠিত সুললিত ভাষায় প্রকাশিত দৃষ্টিপাত বইয়ের শেষ তিনটি লাইন দিয়ে শুরু করছি, *প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা, কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কি? তাকে দেয় দাহ। যে আগুন আলো দেয় না অথচ দহন করে, সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দয় দহনে পলে পলে দগ্ধ হলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য চারুদত্ত আধারকার।* মারাঠি ব্রাহ্মণ চারুদত্ত আধারকার-এর প্রেমের নিদারুণ সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু লাখো প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে লুকায়িত ভালোবাসার সমাপ্তি হয় না কোনোদিন।
প্রেম ভালোবাসা কি? প্রেম একান্তভাবে মানব আত্মার সম্পত্তি। প্রেম অর্থ এক মানব আত্মার সঙ্গে অন্য মানব আত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষা। একটি মানব আত্মার আর একটি মানব আত্মার প্রতি এই যে আকর্ষণ এর মূলে থাকতে হবে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বোধ। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই। সৌন্দর্যই আত্মার কামনার বস্তু, সৌন্দর্যেই তার তৃপ্তি। অন্য কোনোদিকে তার লক্ষ্য থাকার কথা নয়। এই সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাই প্রেমের ধারায় প্রবাহিত - এটাই একের প্রতি অন্যের আসক্তির মূল।
ইংরেজ দার্শনিক মেটারলিংক বলেন, *Certain it is that the natural and primitive relation of soul to soul is a relationship of beauty. For beauty is the only language of our soul; none other is known to it. (The Inner Beauty).*
অবশ্য আমরা যাকে প্রেম ভালোবাসা বলে আবেগে আপ্লুত হই এটাই সব নয়। মানুষের আত্মা দেহের অতীত, সামাজিক বিধি-নিষেধের অতীত এক চিরন্তন সত্তা। প্রেম সেই আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি। দেহের পাপ-পুণ্যের জ্ঞান আত্মার নেই। সুতরাং পার্থিব ভালোমন্দের মাপকাঠিতে বা সমাজের আইনকানুন দিয়ে প্রেমের বিচার করা চলে না।
আত্মার কাছে ব্যভিচার বা অবৈধ প্রণয় বলে কিছু নেই। প্রেমের ভেতরেই তার আনন্দের অভিব্যক্তি। সে প্রেম নিন্দিত বা কলুষিত হতে পারে না - She knows not the numberless sins of the flesh.

আমরা ঈশ্বরপ্রেমে বৈষ্ণব ভাবধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, এখানে প্রেমের বিচিত্র রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পঞ্চসাশ্রয় সাধনা পদ্ধতি থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবধারায়। এই পাচটি রসের মাধ্যমেই প্রেমিক তার প্রেমাস্পদ সাধনা বা ভালোবাসা নিবেদন করতে পারে। শ্রীরাধিকা মধুর রসের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে লাখো বৈষ্ণবের প্রেমের প্রতীক হয়ে আছেন। *প্রিয়েরে দেবতা করে দেবতারে প্রিয়।*

এই প্রেমে শারীরিক কুশ্রীতার দিকে লক্ষ্য নেই, কিছু গোপন করার নেই, অন্যের প্রতি আসক্তিতে পাপ-পুণ্যের বিচার নেই। তার লক্ষ্য কেবল প্রেমাস্পদের দিকে, তার আত্মার চিরন্তন সৌন্দর্যের দিকে। প্রেমের সার্থকতা প্রেমেই - কেবলই আবেগময় ভালোবাসায়, আত্মদানে।

It is in the love that are found the purest elements of beauty that we can offer to the soul... And to love this means that little by little, the sense of ugliness is lost; that one's eyes are closed to all the littleness of life, to all but the freshness and virginity of the very humblest of souls.

আমরা শুধু রক্ত-মাংসের মানুষটাকে ভালোবাসি না। প্রেম আপন গভীরতায় নিজের মধ্যে একটি মোহাবেশ রচনা করে। সেই মোহের দ্বারা যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে নিজের মনের মতো করে কল্পনা করি। যে রূপ তার নেই, মনের মাধুরী মিশিয়ে তার ভেতর তা কল্পনা করি। তার যে গুণের অভাব, মানসপটে সেই গুণে তাকে বিভূষিত করি। বিধাতার যা সৃষ্টি, তার ওপর নিজ মানস উদ্ভূত আরো কিছু আরোপ করে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলি। অনেকে বলে থাকে, কি আছে ওই মেয়েতে বা ছেলেতে, কি দেখে ভুললো? যা দেখে ভুলেছে তা তো ওই মেয়েতে বা ছেলেতে নয়। তা আছে তার বিমুগ্ধ মনের কল্পনায়। The sense of ugliness is lost.

১৪ ফেব্রুয়ারি। আমাদেরও ব্রত হবে দেহের অতীত, সামাজিক নিয়মকানুনের অতীত এক মানব আত্মার সঙ্গে আর এক মানব আত্মার চিরন্তন বিশুদ্ধ প্রেম।

রাজশাহী থেকে

ম

ধ্রুব

তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। অল্প বয়স। একেবারে ঝলমলে তরুণ। এসএসসি-তে ভালো রেজাল্ট করায় একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। হালকা-পাতলা গড়নের নিষ্পাপ মুখের চেহারাটা দেখলে সবাই খুব আদর-স্নেহ, খাতির করতো।

আমি যেদিন প্রথম কলেজে ভর্তি হতে যাই সেদিন আমাদের পরিবারে একটি ঘটনা ঘটে যা কি না দুর্ঘটনার শামিল। ফলে আমার মা-বাবা, ছোট ভাই গ্রামের বাড়ি চলে যায়। বাধ্য হয়ে একটি মেসে উঠি। আমার কলেজ জীবন আর মেস জীবন এক সঙ্গে শুরু হয়। মাকে ছেড়ে কখনো থাকিনি। মানসিক যন্ত্রণা আর উপযুক্ত খাবারের কষ্টে চলতে থাকে দিন। সারা দিন মনমরা হয়ে থাকি এবং পড়াশোনা করি।

শহরে আমার খালা-মামা এবং আরো অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকেন। কারো বাড়িতে যাই না। কিন্তু এভাবে বেশি দিন চলতে পারলাম না। যেভাবে চলতে শুরু করলাম তার মধ্যেই রচিত হলো আমার আজকের এই গল্পটি।

এক দিন দুই দিন করে খালার বাড়িতে আমার ভালোই আসা-যাওয়া শুরু হলো। আমার খালাতো বোন 'ম' আমার সঙ্গে এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে পড়ে কমার্স কলেজে আর আমি পড়ি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে।

ম সুন্দরী, চঞ্চল টাইপের একটি মেয়ে। আমার প্রতি তার সীমাহীন ভক্তি আর কৌতূহল। তাদের বাড়িতে গেলে আমার প্রতি আলাদা যত্ন, আমাকে খামচি দেয়া, আমার মানিব্যাগ চেক করা, আরো কিছু আচরণ যা বলতে না পারা ভালোবাসার নামান্তর। সে আমাকে একটি মায়ার জালে আটকাতে শুরু করে।

মা বাবাকে ছেড়ে একটু ভালো লাগা খুজে পাই এবং ক্রমেই ম-এর প্রতি দুর্বল হতে থাকি। এমন করে বেশ কিছুদিন এগিয়ে গেল। দুজনের অবস্থা একই। কেউ কাউকে কিছু বলছি না। কিন্তু একটি অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছি। তাদের বাসায় না গেলে অপেক্ষা করে, অনেক ব্যাপারে অধিকার দেখায়। আর আমি তাকে না দেখলে যেন খাবার হজম হয় না। তার অধিকার আদায়ের কোনো দাবিকেই অপূর্ণ রাখি না।

ফেব্রুয়ারির এক দিন। শীতকাল। সেদিন আকাশটা মেঘে ঢাকা ছিল। শীতে চারদিকে সব জবুথবু। আমি ম-কে হাত ধরে তাদের ছাদে নিয়ে গেলাম। তার যাওয়ার ভঙ্গিই বলে দিয়েছিল আমার প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে। আমার বুকটা ধড়ফড় করছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। তবুও সাহস করে বললাম, আমি তোকে ভালোবাসি।

মা মাথা নিচু করে একটা দারুণ রমণীয় ভঙ্গিতে আমার ভালোবাসা গ্রহণ করলো।

ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা। শুরু হলো ভালোবাসার পথ। পড়াশোনা মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছি। সারা দিন খালার বাড়ি থাকি। তার দুষ্টুমিমাখা ভালোবাসা আর খুনসুটিতে সব ভুলে যাই। এক পর্যায়ে দুজন দুজনকে দৈহিকভাবে অনুভব করতে থাকি। কিন্তু আমার সাহসে কুলায় না। তার পাশে বসা, খুনসুটি করা, খামচি দেয়া আমাকে সাহস যোগায়।

একদিন তাদের ড্রয়িংরুমের বিছানায় বসে আছি।

ম এসে আমার পাশে বসলো। দূরত্ব কয়েক ইঞ্চি।

একটা ঘোরের মধ্যে আটকা পড়লাম। মাথাটা এগিয়ে তার ঠোটে আলতো করে ঠোট রাখলাম। আমার সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠলো।

মুখ সরাতেই ম দুই হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে বসে রইলো। সেদিন তার সেই নারীসুলভ লজ্জাশীলতার দৃশ্যটা যে কি মধুর ছিল বোঝাতে পারবো না।

সেদিনের পর থেকে সে নিজেই আমাকে কাছে টানতো। তার ঠোট, চিবুক, গলা, বুক, পেট সব আমাকে উজাড় করে দিতো। কতো যে গল্প করেছি দুজনে আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি তা শেষ করার না।

আমাকে ম বলতো, আমার যমজ মেয়ে হবে নাম রাখবো শ্রাবণী আর বর্ষণী। আচ্ছা বিয়ের পর আমি শাড়ি না সালোয়ার কামিজ পরবো।

চেয়ে চেয়ে দেখতাম তার স্বপ্নাতুর চোখ দুটি আর মুগ্ধ হতাম তার ভালোবাসায়।

সময় এগিয়ে চললো। আমি ইন্টারমিডিয়েটে খারাপ রেজাল্ট করলাম।

ম আমার পাশে এসে দাড়ালো। শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরলো। বললো, তুই যদি সারা জীবনও ইন্টারমিডিয়েট পাস না করতে পারিস তবু তোকে বিয়ে করবো। তোকে ছাড়া কাউকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারবো না।

আমার তরুণ হৃদয় সেদিন সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর আমার বাবা সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হলেন। আরো বিচলিত হয়ে পড়লাম। ম আমাকে দাড় করিয়ে রাখলো। আমার সমস্ত বেদনা ভাগাভাগি করে নিল।

গল্পের শেষটা অন্য রকম। ট্র্যাজেডির করুণ পরিণতির শিকার হলাম। এর মাঝে ম-এর বড় বোনের বিয়ে হয়েছে ঢাকাতে। সে একবার ঢাকায় এলো। তারপর কুষ্টিয়া গেল। ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ম আমাকে এড়িয়ে চললো। তার কাছে গেলাম। তাকে প্রশ্ন করলাম।

প্রথম দিকে ম কিছুই বলতো না।

শেষমেশ বললো, তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আমার পরিবার মেনে নেবে না।

আকাশ থেকে পড়লাম না। শুধু ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ভালোবাসার মানুষটাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দেয়া যায় জানতাম না, শিখলাম।

অনেক রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। সারা রাত কেদে চোখ ফুলিয়েছি।

ম নতুন একটা ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। হয়তো তাকেও বলেছে, তোমাকে ছাড়া কাউকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারবো না।

কুষ্টিয়া থেকে

মাথা

–নিজা আহমেদ

গত ২০০৪ যায়যায়দিন–এ ভালোবাসা সংখ্যায় *মা* শিরোনামে আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। তাতে মুরগির মাথা নিয়ে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলাম, মুরগির মাথা আমার পাতে জোটে না। মুরগি রান্না হলে আগেভাগেই সালমার মা (আমার স্ত্রী) মুরগির মাথা গলাধঃকরণ করে ...।

এ লেখা ছাপা হওয়ার কয়েকদিন পরই বাড়ি থেকে স্ত্রীর ফোন এলো। বললো, *যাযাদি–তে* আমার বদনামি কেন তুলে ধরেছো। ঠিক আছে, এখন থেকে বাড়িতে মুরগি রান্না হলে প্রতিটির মাথা তোমার জন্য ফৃজে তুলে রাখবো। তুমি বাড়ি এলে সব কয়টা মাথা এক সঙ্গে রান্না করে দেবো। তোমাকেই খেতে হবে।

এরপর চা সংখ্যায় *গোস্বা হবে শীতল* শিরোনামে চা নিয়ে একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। তাতে উল্লেখ ছিল প্রবাস থেকে ছুটিতে বাড়ি এলে আমার স্ত্রী নিজ হাতে ঘন করে দুধ চা বানিয়ে আমার নির্দিষ্ট বড় কাপে পরিবেশন করে। এই লেখা যখন যাযাদিতে ছাপা হবে তখন আমার স্ত্রীর গোস্বা কিছুটা হলেও শীতল হবে। ইনশাআল্লাহ, আর কয়টা মাস পর বাড়িতে যাবো। কাজেই এখন থেকে কিছুটা হলেও স্ত্রীর প্রশংসা তুলে ধরতে হয়। হয়তো ঘন দুধের চায়ের আড়ালে মুরগির মাথা হারিয়ে যাবে।

না, মুরগির মাথা হারিয়ে যায়নি। আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। গত সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখ শারজাহ থেকে দুই মাসের ছুটিতে বাড়ি এলাম। প্রথম দিন রাতেই পরিবারের সবার সঙ্গে খেতে বসে আমার সামনের বাটিতে মুরগির অন্যান্য টুকরার সঙ্গে তিনটা মুরগির মাথার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ হলো।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কয়টা মুরগি রান্না করেছো?

উত্তর দিল, একটা।

তাহলে একটা মুরগির তিনটা মাথা কি করে হলো?

আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, এই তিনটা খাও। ফৃজে আরো কয়েকটা আছে, পরে রান্না করে দেবো। তোমার মনে নেই যাযাদি-তে মুরগির মাথা নিয়ে আমার বদনামি তুলে ধরেছিলে! তাই তোমার আসার খবর পেয়ে বেশ কিছু দিন থেকেই মুরগি রান্না হলে মাথাটা আলাদা করে তোমার জন্য ফৃজে তুলে রাখি।

সঙ্গে খেতে বসা মেয়েরাও আমার প্রতি এবং মুরগির বাটির প্রতি এমনভাবে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখছে যা বলার মতো নয়। তখন চোখের ওপর ভাসছে চিড়িয়াখানাতে সিংহ অথবা বাঘের সামনে তাজা মাংস ছুড়ে দেয়ার দৃশ্যটা। বাড়িতে আসার প্রথম রজনী বলেই তেমন রাগ না করে স্বাভাবিক মুচকি হেসে ভাতের প্লেটে হাত রাখলাম। কিন্তু না, স্ত্রী নিজ হাতেই আমার প্লেটে মুরগির মাথাগুলো খোশ মেজাজে তুলে দিতে উদ্যত হলে আমি বারণ করে বললাম, ঠিক আছে, আমি নিজ হাতে নেবো। তোমরা খাও।

অনেকটা হাসাহাসির মাঝে একটা মুরগির মাথা খেলাম।

বাড়িতে যতোদিন ছিলাম মুরগি রান্না হলেই স্ত্রী নিজ হাতে মুরগির মাথাটা আমার প্লেটে পরিবেশন করতো। শুধু মুরগির মাথা বলে নয়, বাজার থেকে বড় মাছ তথা রুই–কাতলা এনে দিলেও বড় প্লেটে আলাদা করে মাছের মাথাটা আমার সামনে রাখতো। ভাগ্যিস, বাড়িতে থাকার সময় ছাগল অথবা গরু জবাই দিইনি। দিলে হয়তো...।

শুধু নিজ গৃহে মুরগির মাথা পরিবেশনে সে ক্ষান্ত হয়নি। তার সঙ্গে তার দুই বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মুরগির মাথাটা কোনো যানজট ছাড়াই সরাসরি আমার প্লেটে চলে আসে। মোট কথা, যাযাদির লেখাটা সবার কানে পৌছে গেছে।

বাড়িতে থাকার সময় এবার আরেকটা জিনিস নতুন আবিষ্কার করলাম। তা হলো আমার স্ত্রীর পান খাওয়া। ইদানীং সে মাঝে মধ্যে পান খাচ্ছে। এ নিয়ে কিন্তু আমার বেজায় গোস্বা। আমার নিষেধ অমান্য করে দৈনিক দুই তিনটা পান সে খাবে। অন্য রুম থেকে পান বানিয়ে মুখে দিয়ে আমার পাশে এসে বসে মুচকি হেসে রসালোভাবে পান চিবুতে থাকে। তার লাল করা ঠোট এবং মায়াভরা হাসি দেখে আমার গোস্বা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর তখনই মনে পড়ে রুনা লায়লার কণ্ঠে গাওয়া গান, *ও-ও-পান খাইয়া ঠোট লাল করিলাম বন্ধু ভাগ্য হইলো না...*।

আমি প্রবাসী। দুই মাস স্ত্রীর পাশে ছিলাম। যেখানে যেতাম সঙ্গে নিয়ে যেতাম। এমনকি বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে বারৈয়ার হাটে কাচাবাজারে গেলেও সে সঙ্গে থাকতো। দেখে দেখে তার পছন্দ অনুসারে বাজার করতো। একদিন দূরসম্পর্কীয় এক ভাগ্নের শাড়ির দোকানের পাশ দিয়ে একলা যেতেই জিজ্ঞাসা করে বসলো, মামা আজ আপনার সঙ্গী কোথায়?

না বোঝার ভান করে উত্তর দিলাম, সঙ্গী আবার কে?

ভাগ্নে আবার মনে করিয়ে দিয়ে বললো, মামিকে দেখছি না কেন?

পরক্ষণেই মুচকি হেসে বললাম, আজ তোমার মামির শরীর তেমন একটা ভালো নেই। তাই একা আসতে হলো। আর কালবিলম্ব না করে ভাগ্নের শাড়ির দোকানে ঢুকলাম। ভাগ্নে তার মামিকে মামার সঙ্গী সম্বোধন করায় ভালোবাসার আবেগে আপ্লুত হয়ে একটা শাড়ি কিনে ফেললাম। শাড়ি হাতে বাড়ি এলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো, শাড়ি কেন এনেছো? আমার তো শাড়ি আছে।

বললাম, পছন্দ হলো তাই নিয়ে এলাম।

অর্ধশত বছর বয়স পার করে দিলাম। পার করে দিলাম প্রবাস জীবনের তেইশটা বছর। দুই মাসের ছুটিতে এসে পাচ মেয়েকে (দুটোকে বিয়ে দিয়েছি) নিয়ে হই চই এবং আনন্দের মাঝে কখন যে হঠাৎ করে সময় শেষ হয়ে গেল টেরই পাইনি।

অবশেষে ২৫ নভেম্বর বিদায় নিয়ে আসার আগে পরিবারের সবাই এবং আগত অতিথিদের সামনে থেকে ইশারায় সে (স্ত্রী) আমাকে নিয়ে গেল ভেতরের রুমে।

পা ছুয়ে সালাম করে জড়িয়ে ধরে কেদে কেদে বলতে লাগলো, আমার জন্য দোয়া করো, যাতে ভালো থাকি। আমিও খোদার কাছে প্রার্থনা করবো তুমিও যাতে ভালো থাকো।

আমিও কান্না থামিয়ে রাখতে পারিনি। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আবার সবার সামনে এসে শেষ বিদায় নিয়ে পা বাড়ালাম। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে এসে আবার পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, বাড়ির দরজায় সবার সঙ্গে সেও (স্ত্রী) আমার প্রতি চেয়ে আছে।

হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদন জানাতে গিয়ে আবার চোখ দিয়ে অঝোরে পানি বের হতে লাগলো। পথিমধ্যে আব্বা-আম্মার কবর জিয়ারত শেষ করে চট্টগ্রাম শাহ আমানত এয়ারপোর্ট উদ্দেশে রওনা দিলাম।

শারজাহ, ইউএই থেকে

হঠাৎ একদিন

-সামিরা সুলতানা

অনেকক্ষণ ধরেই হাটছি। যেন অনেকটাই উদ্দেশ্যহীনভাবে। জারুল, কৃষ্ণচূড়া আর নাম না জানা হলুদ ফুলগুলো যেন নানা রঙের তুলির আচড় কেটে দিয়েছে সারা ক্যাম্পাসে। হাটতে হাটতে কখন যে আনমনা হয়ে গেছি টেরই পাইনি। এই আমার একটা দোষ, হঠাৎই আনমনা হয়ে পড়ি।

দশটায় ক্লাস, এখন পৌনে দশটা বাজে, কোনো খেয়াল নেই।

আমার নাম নীলিমা, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। ফার্স্ট ইয়ার থেকে আজ পর্যন্ত অনেকটা সময় ক্যাম্পাসে দিয়েছি কিন্তু আমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের খুব কাছাকাছি আজও যেতে পারলাম না বা যাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্লাস শেষে আর বসা হয় না। যদিও বসা হয় পাশের বন্ধুর সঙ্গে টুকটাক আলাপের পরই অস্থির লাগে, বেরিয়ে আসি ক্লাস থেকে। জোরে নিঃশ্বাস ফেলি আর মুচকি হাসি। কখনো পাশের কেউ হঠাৎ হেসে ফেললে চমকে যাই, আমাকে নিয়ে হাসছে না তো?

না আমি ভাবুক শ্রেণীতে পড়ি না। তবে নিজের মনে থাকি। হেটে বেড়াই অনেকটা পথ, কখনো পথের ধারে মুড়ি মাখানো, আম ভর্তা বা ভেলপুরি খাই। কখনো বা প্রচণ্ড রোদে চা পান করে ঠাণ্ডা হই। ক্যাম্পাসে এতো আম গাছ, যা আমে উপচে পড়ে, কখনো খুব ইচ্ছে হয় ঢিল ছুড়ে আম পাড়ি। কিন্তু হয় না।

টিচারের প্রায় সঙ্গেই ক্লাসে ঢুকলাম, বসলাম একদম শেষ সারিতে। ক্লাস শুরু হবার একটু পরই চোখের কোন দিয়ে লক্ষ্য করলাম একটা চোখ আমাকেই দেখছে। কি মুশকিল, আমাকেই দেখছে নাকি অন্য কাউকে? কেন দেখছে? প্রচণ্ড অস্বস্তি ঘিরে ধরলো আমাকে।

ক্লাসে আর মন বসছে না। হঠাৎ এতটাই আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম যে কয়েক মিনিটের লেকচার কানে ঢুকলো না। যখন অস্বস্তি ঝেড়ে নিজের মাঝে ফিরে এলাম তখন লেকচার চলছে যেন প্রচণ্ড গতিতে...চুপ করে বসে রইলাম, নাহ! আর ইচ্ছে করছে না লিখতে।

একটা সময় ক্লাস শেষ হলো। বেরিয়ে এলাম আস্তে করে, বুঝলাম আজ আর কিছুই হবে না আমাকে দিয়ে। কি করবো এখন ভাবতে ভাবতেই থমকে গেলাম– হ্যা এই ছেলেটাই তো, পথ আগলে দাড়িয়ে আবার মুচকি মুচকি হাসছে।

দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

ছেলেটা একগাল হাসি দিয়ে বললো, তুমিই কি নীলিমা আফরোজ?

বললাম, হ্যা, কেন?

ছেলেটা ব্যাগ থেকে যা বের করলো তা দেখে তো আমার এবার অবাক হবার পালা। আমার অতি প্রয়োজনীয় কালো একটা ডায়রি যা দুই সপ্তাহ ধরে নিজের ঘরেই খুজে বেড়াচ্ছি। ডায়রিটা এই ছেলেটার হাতে কিভাবে? তবে কি ক্লাসেই হারিয়েছি?

ছেলেটা আবার একটু হেসে এগিয়ে দিল ওটা, এটা তোমার তো?

আমি ছোট্ট করে বললাম, হুম।

শুধু হুম? থ্যাংকস বলবে না? তোমাকে কত খুজেছি জানো? ছেলেটি বললো।

ছেলেটার এত আপন আপন ভাব দেখে অবাক হলাম। বললাম, থ্যাংকস। কোথায় পেলে?

আমার ফ্রেন্ডরা যাচ্ছে, চলো যেতে যেতে কথা হবে... ছেলেটা তাড়া দিয়ে বললো।

ব্যস্তভাবে বললাম, সে তুমি যাও, আমার কাজ আছে। ও হ্যা, তোমার নামটা?

ছেলেটা ছোট্ট করে বললো, আনন্দ।

আমরা কথা বলতে বলতে করিডোরটা পেরিয়ে গেছি অনেকক্ষণ। ডাকসুর সামনে দিয়ে হেটে চলেছি। কেন জানি না কথা ফুরাচ্ছেই না, আনন্দ ছেলেটা খুব বেশি আনন্দের ছোয়া দিয়ে যাচ্ছে কি?

মনের মধ্যে কি একটা কথা দুরু দুরু করে বেজেই চলেছে। নিজের অজান্তেই হেসে উঠলাম।

এই পৃথিবীটা আজও এতো সুন্দর এই ছোট্ট ছোট্ট মুহূর্তের জন্যই।

ঢাকা থেকে

লাইলী এক্সপ্রেস

–জসীম ছিদ্দিকী

এই কাহিনীর প্রেমিক যিনি তিনি বর্তমানে একজন পাগল। রাস্তায় যার বসবাস। ময়লা আবর্জনা পকেটে রাখা যার নিত্য অভ্যাস। অথচ যখন তিনি প্রেমিক ছিলেন তখন তার চলন ছিল অন্যরকম। যা সিনেমার নায়কদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। ডিগ্রি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। এখনো ইংরেজিতে বুলি আওড়ান। তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপুরুষ। তবে তার বাবা ছিলেন সে সময়ের একজন গুণ্ডা (বর্তমানের সন্ত্রাসী)। সঙ্গত কারণে কাহিনীর চরিত্রের নাম দিলাম না। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি হজ পালন করে হাজির খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। তারপরও তার আগের পরিচয়টিই মুখ্য হয়ে দাড়ালো তার ছেলের জীবনে।

ছেলের নাম ধরুন মজনু। ভালোবাসতো একই এলাকার এক রাজস্ব কর্মকর্তার খুব সুন্দরী কন্যা লাইলীকে। তারাও ছিল একই এলাকার বাসিন্দা। তবে পরিবারটি ছিল শিক্ষিত। অন্যদিকে মজনুর পরিবার ছিল বকলম। শুধু মজনুই পড়ালেখা করেছিল।

মজনু যখন রাস্তা দিয়ে হাটতো তখন কেউ তার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেলে বলতো *না, দেখর ট্রাক চলের*। পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত। প্রভাব এতো যথেষ্ট ছিল, তার প্রতি উত্তরে কেউ সাহস পেতো না। অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সেই মজনুর আজ রাস্তার পাগল। নেই তার পরিবারের সেই দাপট।

মজনু ভাই ভালোবাসতেন লাইলীকে। লাইলীও ভালোবাসতেন শুনেছি। কিন্তু তাদের মিল হলো না। লাইলীর পরিবার একটি গুণ্ডার ছেলের কাছে (যদিও ছেলে শিক্ষিত) তার কন্যাকে অর্পণ করতে রাজি হয়নি, তাই এই মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে এবং পরবর্তী সময়ে পারিবারিক কিছু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মজনু ভাই পাগল হয়ে গেলেন। তার ভালোবাসার লাইলী বর্তমানে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের ঘরণী।

এই মজনু ভাই তার লাইলীর নামে দুইটি রিকশা বানালেন। একটি রিকশা সব সময় লাইলীর বাসার সামনে থেকে তাকে কলেজে নিয়ে যেতো আর অন্য রিকশাটি কলেজ থেকে তাকে বাসায় নিয়ে আসত। নাম দিয়েছিলেন রিকশা দুটোর *লাইলী এক্সপ্রেস*। চালকদের সাধারণত মালিককে ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু মজনু ভাই উল্টো চালকদের বেতন দিতেন। আজও মজনু ভাইয়ের *লাইলী এক্সপ্রেস* রাস্তায় চলে, একই চালক। তবে মজনু ভাই রাস্তার পাগল।

ভালোবাসার বেদনাবিধুর এই ঘটনার বর্ণনাকারী হলো লাইলী এক্সপ্রেসের চালক।

চট্টগ্রাম থেকে

খুব জানতে ইচ্ছা করে

খুব জানতে ইচ্ছে করে, তুমি কি সেই আগের মতোই আছো নাকি অনেকখানি বদলে গেছো – মান্না দে-র মতো আমারও খুব জানতে ইচ্ছা করে তুমি সেই আগের মতোই আছো নাকি অনেকখানি বদলে গেছো। জানতে ইচ্ছা করে মহানন্দা তীরের সেই ছোট্ট শহরে (এখন জেলা) গেলে আগের মতোই তোমাদের বাড়ির গলির মুখে দাড়িয়ে গলির ওপারে থাকা দোতলা বাড়িটার জানালায় দৃষ্টি থমকে যায় কি না দুটি কাঙ্ক্ষিত চোখের প্রত্যাশায়। জানি বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, তবু জানতে ইচ্ছা করে।

জানি না সমাজ–সংসার কোন চোখে দেখবে এই জানতে চাওয়াটা। বধূ মাতা কন্যা ছাড়াও নারীদের নিজস্ব একটা সত্তা, একটা পরিচয় আছে যা কি না মাঝে মধ্যে হলেও জেগে ওঠে – এ সত্যটা মেনে নেয়াও যে সমাজ–সংসারের পক্ষে সহজ নয় তা জানি। কিন্তু মন কি সমাজ–সংসারের সব বিধিনিষেধ

মেনে চলে? মনও নদীর মতোই আপন বেগে পাগলপারা। মাঝে মধ্যে আমার সকল পরিচয় হারিয়ে যায়। শুধু বেচে থাকে ৪০–৪৫ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক ভাবুক কিশোরী, চঞ্চল ছটফটে তরুণী।
আম বাগানের ছায়া ঢাকা পথ, জোছনা রাতের তারা ভরা আকাশ, মহানন্দার অনেক ঢেউ সেই যুবতীর জীবনের অনেক ঢেউ–এর খবর রাখে। সেসব কি ভোলা যায়? ঝড় উঠলে যে মেয়েটি তরতর করে ছাদে চলে যেতো, ঝড়ের বাউল বাতাস যার কোকড়ানো চুল এলোমেলো করে দিতো, শুধু চুল নয়, তার মনটাও ওড়াতো, ঝড়ের রাতে যে আপন মনে গাইতো – আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরান সখা বন্ধু হে আমার।
অনেক অদেখা ঝড় তার মনের দুয়ার ভেঙে ফেলে আর সেই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে অনেক আগে ফিরে যাওয়া একটি ব্যথিত মুখ। আজকাল মাঝে মধ্যে তোমাকে মনে পড়ে যায়। বয়স হলে মানুষ নস্টালজিক হয়ে যায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাকেও নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছে। ঘুরে ঘুরে আসছে সেই মহানন্দার ঢেউ, আম গাছের ছায়া ঢাকা পথ, কমলা রঙের গাদা ফুলের সেই অপূর্ব সুন্দর ছোট্ট বাগান। সব যে আমায় নিশিডাকের মতো ডাকে। মনে হচ্ছে কিছুই ভুলিনি, ভুলে থাকতে চেয়েছি, ভুলে থেকেছি মাত্র। এতো বছর পর কাচা–পাকা চুলের বর্ষীয়সী রমণীকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে এক ভাবুক কিশোরী, চঞ্চল যুবতী। তাই তো ভালোবাসা দিবসে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার কথা মনে পড়ে যায়। আর সেজন্যই কলম ধরেছি।
জানি না, এ লেখা তুমি কোনোদিন পড়বে কি না। এটি আদৌ ছাপা হবে কি না কে জানে। ছাপা হলেও তোমার চোখে না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।
যায়যায়দিন পড়ো তুমি? নাইবা পড়লে, নাইবা জানলে তোমার হারিয়ে যাওয়া কমলার শেষ প্রশ্ন যা সে কোনোদিনও সামনাসামনি তোমাকে করবে না, হয়তো সে প্রশ্ন করার সাহস আর সুযোগ কোনোটাই জীবনে আসবে না, তবু তার মনের হঠাৎ জাগা প্রশ্নটা তো সে অস্বীকার করতে পারছে না। এ সত্যটা কমলার মন জানে আর জানবে যায়যায়দিন–এর ভালোবাসা দিবসের অগণিত পাঠক।
সত্যি, আমার নিজেরও খুব অবাক লাগে যে প্রশ্নটা আজ সকল লাভক্ষতির বাইরে। সে প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বেলা শেষের মনের এ ব্যাকুলতা কেন? মন সত্যিই অচিন পাখি। যে মানুষটাকে একদিন স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলাম, সমাজ–সংসারের চাপে হলেও ছেড়ে দেয়াটা তো সত্যি। যার শত চেষ্টাতেও একবারের জন্যও ঘুরে দাড়াইনি তাকে কেন অবেলায় মনে পড়ে যায়! কেন মনের এ সর্বগ্রাসী কৌতূহল, তোমাকে কি এখনো মনে পড়ে তার? কেন বড় জানতে ইচ্ছা করে কোথাও মনের কোনো গহিন অন্ধকারে একটি নাম আজো জেগে আছে কি না? এক গোছা কমলা রঙের গাদা ফুল হাতে দাড়িয়ে থাকা যুবতীর ভীরু চাহনি কখনো মনে পড়ে যায় কি না।
কমলা নামটা তোমার মনে আছে, নাকি ভুলেই গেছো? মহানন্দা পারের সেই কমলা নামের দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে। তুমি তো জানো ওই নামটা তার আসল নাম নয়। ওই নামটা তোমরা দিয়েছিলে, সম্ভবত শিশিরদা নামটা দিয়েছিল। অবশ্য আমাদের কয়েকজনেরই একটা করে ছদ্ম নাম ছিল, যা কেবল আমরাই জানতাম। পূর্ণা, পূর্ণিমা, এলোকেশী–সর্বনাশী। আজ আর কেউ এলোমেলো সর্বনাশী নেই, সবার কেশেই পাক ধরেছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে অধিকাংশ। আমিও সেই পথের পথিক হতে চলেছি। জানি না, সবার এমন হয় কি না। পূর্ণা, পূর্ণিমা, ওদেরও সেই হারিয়ে যাওয়া মহানন্দা, জোছনা রাতে মহানন্দায় স্নান, আম বাগানের ছায়াঘেরা পথ মনে পড়ে কি না, মনে পড়ে কি না তাদের হারিয়ে যাওয়া নাম আর নামের ইতিহাস। আমার তো সব মনে পড়ে যায়। *খুব জানতে ইচ্ছা করে তুমি আগের মতোই আছো নাকি অনেকখানি বদলে গেছো!*
শুনেছি, তুমি মাঝে মধ্যে যাও ওই শহরে। খুব স্বাভাবিক, আত্মীয়–স্বজন আছে, নাড়ির টান, না গিয়ে পারবে না। পথে যেতে যেতে আমাদের বাড়ির কাছে এসে আজো কি থমকে দাড়াও?

আমিও যাই মাঝে মধ্যে, তবে ইদানীং খুব কম যাই। বড় ব্যস্ত জীবন আমার। খ্যাতির বিড়ম্বনা আছে জান তো। গলি পথে পুরনো পায়ের চিহ্ন খোজার সময় কোথায়? তবুও মনে পড়ে যায়, জানতে ইচ্ছা করে। খুব অবাক হচ্ছো! একদিন যে স্বেচ্ছায় ছেড়ে গিয়েছিল, শত ডাকেও একবারও পিছু ফিরে তাকায়নি, তার এ কোন খেয়াল!

আমি নিজেও জানি না, মনের এ পাগলামি কেন। স্বামী-সন্তান, নাতি-নাতনিসহ মোটামুটি সফল জীবনে কেন ছায়া ফেলে বহু বছর আগে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো, কেন হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে এ অদ্ভুত জিজ্ঞাসা! এই বয়সে কৌতূহল ছাড়া এ আর কি হতে পারে?

তুমি যে আমায় আজো ভোলোনি তার প্রমাণ মনে হয় বান্ধবীদের কারো সঙ্গে দেখা হলে তুমি সবার কথা জিজ্ঞাসা করো, সবার খোজখবর রাখো, শুধু আমার কথা ভুলেও জিজ্ঞাসা করো না। আমার ব্যাপারে কিছু জানতে না চাওয়াটাই প্রমাণ করে তুমি আমায় ভোলোনি, তাই নয় কি? তুমি ভালো করেই জানতে আমিই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। তাই বোধ হয় আমার সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়ার সাহস হয়নি।

সব পূর্ণতার মাঝেও বুঝি অপূর্ণতার সুর বাজে। তাই বুঝি এই ভালোবাসা দিনে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে খুজে ফেরে মন! মনের সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা আমাদের গেছে যেদিন একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি? তুমি যদি কখনো এ লেখা পড়ো আর বুঝতে পারো তোমার হারিয়ে যাওয়া কমলার এ লেখা তবে তার শেষ জিজ্ঞাসার উত্তরটা দিও।

হঠাৎ দেখা নায়িকার মতো আমার মনও খুশিতে হয়তো ভরে উঠবে যদি সে শোনে রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী থেকে

রহস্য

–মোহাম্মদ এম হোসাইন

মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করবো। যে প্রেমে থাকবে না কোনো ভয়-ভীতি, বাধা-বিপত্তি। ভাগ্যের ফেরে বিয়ে হয়ে গেল আপন জেঠাতো বোন আই মিন বাবার বড় ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে। উভয় পরিবারের মতামতের ভিত্তিতে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলাম।

তাহলে আমার সূত্রমতে এবারে সেই কাঙ্ক্ষিত প্রেমপর্ব। যদিও সে আপন জেঠাতো বোন তবুও তার সঙ্গে খুব একটা দহরম-মহরম ছিল না। কিন্তু তার সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল যে সে সহজ, সরল, মেধাবী তবে আহামরি সুন্দরী নয়। গুণের কাছে রূপকে আমি মূল্যহীন মনে করি বিধায় এ বিয়েতে মত দেয়া। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন স্বভাবগত দিক থেকে সে অত্যন্ত ঘরকুনো।

চাকরির সুবাদে ঢাকায় থাকি। পনেরো দিনের ছুটিতে বাড়ি এসে এগারো দিনের মাথায় বিয়ে হলো। দুজনের বাড়ির দূরত্ব চল্লিশ গজ। একাধিক কারণ দেখিয়ে প্রথম রাতেই আমাদের বাসর থেকে বিরত রাখা হলো। মনের ভেতরে অজানা দুঃখ, প্রকাশ করার জায়গা নেই।

বিয়ের তিন দিন পর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। নিয়ম অনুসারে আমাকেও যেতে হলো। স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে বসে কিছু কথা বলবো বা তাকে কিছুক্ষণ একান্তই নিজের করে পাবো এমন বাসনা মনের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে আছে। শ্বশুরবাড়িতেই এক রাতে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস (!) (এক বিছানায় শোয়ার) করার অনুমতি পেলাম। মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। আপন জেঠাতো ভাই-বোন হওয়ায় দুজনে দুজনার কাছে লাজুক হয়ে গেছি এটা আমি অনুভব করতে পারছি।

বিছানায় শুয়ে আমি কি করবো তা ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। ভাবলাম মেয়েদের নাকি একটু শরম বেশি। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তাই আমাকেই শরম ভাঙাতে হবে। প্রথমে তার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলার

চেষ্টা করি। কিন্তু তার কোনো সাড়া পাই না। সে নন অ্যাকটিভ। তার বুকে হাত দেয়ার চেষ্টা করলে সে বাধা দেয়, আমি লজ্জিত হই। আবার ভাবি, প্রথম প্রথম এ রকম হতে পারে।

জোরাজুরির এক পর্যায়ে সালোয়ারের ফিতা খুললে কান্না জুড়ে দিল। কি বিপদে পড়লাম রে বাবা! এক হাতে তার মুখ চেপে ধরে বোঝাতে লাগলাম। নিজের বিবেককে প্রশ্ন করলাম, একটা মেয়েকে ভীতসন্ত্রস্ত রেখে সঙ্গম করাটা কতোটা যৌক্তিক? ধর্ষণের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। নিজেকে পশুর আচরণ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে স্ত্রীর কাছে নিজের মহত্ত্ব দেখানোর জন্য তাকে বোঝালাম যে, আমার শত কষ্ট হলেও তোমার সঙ্গে আজ আমি মিলিত হবো না। ঠিক তুমি যেদিন চাইবে সেদিনই মিলিত হবো। কারণ তোমার কোনো কষ্ট হোক এটা আমি চাই না।

মনে মনে ভাগ্যকে ধিক্কার দিলাম, হায়রে চাকরি, একদিন পর চলে যেতে হবে। অথচ বৌ-এর কাছে মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে যৌবন থেকে একটা মূল্যবান রাত নষ্ট করে ফেললাম।

স্ত্রীর প্রতিও মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলাম। এমনকি তাকে বললাম যে, তোমার চেয়ে ছোট মেয়েরা দিব্যি স্বামীর সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি এতোটা নাবালিকা নও যে স্বামী, সংসার এসব কিছুই বোঝো না। আইএসসিতে পড়া একটা মেয়ে তুমি, তোমার পূর্ণাঙ্গতার বয়স ছুই ছুই অথচ তুমি যেন কিছুই বোঝো না। কচি খুকি। তার কান্নায় আমিই বিচলিত হয়ে গেলাম। ঠিক আছে কোনো চিন্তা করো না, তোমার সব কিছুই আমি মানিয়ে নেবো। পরের ছুটিতে এলে দুজনে সিদ্ধান্ত নেবো।

কথায় বলে কপালে না থাকলে ঘি ঠকঠকালে হবে কি? এরপর একাধিকবার ছুটিতে গেছি কিন্তু তার রহস্যজনক আচরণ আমাকে সন্দিহান করে তুলেছে।

পরে আরেকবার যখন মিলিত হতে চেয়েছিলাম তখনো সেই একই আচরণ। ওরে বাবা, ওরে মা, বাচবো না, মরে যাবো ইত্যাদি।

এ অবধি আমার বিয়ের এক বছর আট মাস চলে অথচ তার সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্ক বা লেনদেন হয়নি। এমনকি তার গায়ে হাত স্পর্শ করলেও সে বিরক্তি প্রকাশ করে। এ রকম আচরণে আমার মনটা বিষিয়ে উঠেছে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি স্বেচ্ছায় তার কাছে আমি কোনোদিন আমার দৈহিক বা জৈবিক চাহিদার কথা বলবো না। দেখি সে কতোদিন এভাবে থাকতে পারে। তার দেয়া এসব মানসিক আঘাতে আমি পর্যুদস্ত। তারপরও আজো আমি তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করিনি। বরং সেই কোনো চিঠি লেখে না, আমিই লিখি। বাড়িতে গেলে আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমাদের বাড়িতেও আসে না। আমার মা-বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গেও কথা বলে না। আমিও সে জন্য তারই মতো আচরণ শুরু করেছি, দেখি কোথাকার জল কোথায় যায়।

তাকে প্রথম হুশিয়ারি দিয়েছি ২০০৬-এ আইএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর পড়ালেখা শেষ। অমানুষকে লাইব্রেরিতে বন্ধ করে রেখেও মানুষ বানানো সম্ভব না। আমার আচরণের পরিবর্তন করবো ভাবছি। কারণ যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে ঠিক হবে না। এ হলো আমার ভালোবাসাহীন বিষাদময় দাম্পত্য জীবন। আমার এ দিল্লিকা লাড্ডু নিয়ে ভাবতে ভাবতে কবে যে যাযাদির টাক সংখ্যায় লিখতে হবে তাই ভাবছি। কারণ যে হারে চুল ওঠা শুরু হয়েছে তাতে মনে হয় বেশিদিন লাগবে না সেই গর্বিত টাকের মালিক হতে।

মাওলানা পাঠক যদি কেউ থাকেন যাযাদির মাধ্যমে জানাবেন, সাক্ষাৎবিহীন এক বছর আট মাসের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শরিয়ত মতে ঠিক থাকে কি? আমার জানা মতে তিন মাস স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ না হলে নাকি স্ত্রী তালাক হয়। আমার স্ত্রী তালাক হয়েছে কি?

আর মেয়ে পাঠক যারা তাদের কাছে প্রশ্ন যে, আমার স্ত্রী কোন জাতের মেয়ে? এর ধরনটা কি? আমার এ কাহিনী যদি কাউকে এতোটুকু ব্যথিত করে আমার অনুরোধ যাযাদির মাধ্যমে আমাকে মতামত দেবেন।

আর আমি আমার এ লেখাটি যদি প্রকাশ হয় তাহলে আজব সেই সহধর্মিণীকে লেখাটি দেখিয়ে বলবো তোমার কথা দেশবাসীর কাছে পৌছে দিয়েছি। তারাই বিচার করবে তুমি আসলে কি? পাঠকরা অন্তত

আমার দুঃখটা অনুভব করতে পারবে যা তুমি পারোনি। তোমার সম্পর্কে মন্তব্যটা আমার পরিবর্তে যাযাদির পাঠকরাই করুক এটাতেই আমি বেশি সন্তুষ্ট।
ভালোবাসা সংখ্যায় আমি যেন এক ভালোবাসার কাঙাল। পারবে কি কেউ পুষিয়ে দিতে?

রাজারবাগ, ঢাকা থেকে

গাঢ় বন্ধন

–শাহেদ শফিক

বিসিআইসির কারখানাগুলোর চাকরিতে মজার অন্যতম দিক হলো হাউজিং–এর সুবিধা। ১৯৯২ সালের এপৃলের কোনো এক রাতের ডিউটিতে সহকর্মী জিল্লু বললেন, স্কুলে ফিজিক্সের একজন নতুন ম্যাডাম জয়েন করেছেন। নাম বন্যা। আপনাদের সমসাময়িক হতে পারে। বাসায় আসেন, পরিচয় করিয়ে দেব। ফিজিক্স বলাতে নামটার মধ্যে পরিচিত গন্ধ পাচ্ছিলাম। কোনো অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা বললে ব্যাচেলর হিসেবে না বলে, এমন কতোজন আছে?

সময় করে যাব বলে সম্মতি দিলাম।

নিরেট গ্রামের মাঝে কারখানাটি যেন জোনাকি বাতি। U আকারে উত্তর–পূর্ব–দক্ষিণ ঘিরে ফ্যামিলি বিলডিং, মাঝে মসজিদ। U–এর দুই বাহুর সম্মুখ দিকটায় ক্লাব, মেডিকেল সেন্টার ও ব্যাচেলর হস্টেল বা ডরমেটরি। এর মাঝখানটায় টিপ হয়ে জ্বলজ্বল করছে সুন্দর খেলার মাঠসহ স্কুলটি। মসজিদ থেকে ফিরে আসার পথে একদিন বন্যার সঙ্গে দেখা। আমার আন্দাজ সঠিক দেখেই চিনতে পারলাম একই বর্ষের সহপাঠিনী।

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছ বন্যা? শুনেছি জয়েন করেছ। তো কেমন লাগছে সব?

প্রশ্ন করে গেলাম একাধারে।

হতচকিত হলো বোধ করি। মিনিটখানেক ঝিম মেরে থেকে উত্তর দিল, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এটা কেমন উত্তর মনে মনে ভাবলাম। সঙ্গে তার সহকর্মী। তিনিও হতচকিত। পুরো পরিচয় দিয়ে ঘোর ভাঙালাম।

স্কুল থেকে ফিরছো অবশ্যি। পরে এক সময় কথা বলবো। বিদায় নিলাম। সে হাফ ছেড়ে বাচল বোধ হয়।

নিজে ঘুরপাক খেলাম। দুটি বছর পাশাপাশি ডিপার্টমেন্ট ও একই ইয়ার–এ, সাবসিডিয়ারি বিষয় একই হওয়ার পরও চিনতে পারলো না; কেন? ভাব নেয়া কি? কেনই বা তা? আমি চিনতে পারলাম কি করে? নেহাত মেয়েমানুষ বলে চিনে রেখেছি। হয়তো তাই। পেছনে ফিরে বুঝলাম, আমার মধ্যে স্পেশালিটি তো কিছুই ছিল না। না চিনতে পারারই কথা। ভাবনাগুলো কিলবিল করছিল বোকা বনে যাওয়াতে।

অনেকদিন খবরাদি নেয়া হয়নি। একদিন জিল্লু বৈকালিক চা–এর নিমন্ত্রণ দিলে দ্বিতীয় চিন্তা নিয়ে পা বাড়ালাম। নতুন করে এবং বিস্তারিত আলাপ হলো। ছয় বছরে নয়, এক বিকেলেই বন্যার নাড়ি–নক্ষত্র জেনে নিলাম।

প্রথম পরিচয়ের ভুল সরি বলে শোধরালে ভেতরে ঠাণ্ডা হলাম। এরপর মাঝে মধ্যে দেখা হতো, করতাম এবং সুবিধা–অসুবিধা বলতো, জেনে নিতাম। তার ভাই, আত্মীয়রা বেড়াতে এসে আমার এখানেই উঠতো।

তার বড় দুলাভাই এলেন একদিন। রাতে কথা বলতে গিয়ে দুলাভাই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন সরাসরি।

এজন্যই কি তার আগমন? মনে মনে ভাবলাম। বাবা–মায়ের সম্মতি চাইবো বলে দুলাভাইকে জানালাম। মনে মনে হ্যা বলেছিলাম বোধ করি আগেই। বন্যার সঙ্গে কথা বললাম –

একেবারে প্রস্তাবই দিয়ে ফেললে?

বয়স তো হয়েছে; নয় কি?

ভালোই সাহস তোমার।

ঘর বাধার স্বপ্ন কে না দেখে? এ ছাড়া...। আচ্ছা, তুমি কি কিছুই ভাবছিলে না?

তোমার বলা শেষ হয়নি।

আজকেই শেষ করবে?

বিদায় নিলাম প্রস্তাবের ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলে। কেননা জিল্লু ভাবী (বন্যার সহকর্মী) অন্য একজন মেয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম। বন্যা কথা বলবে বললে সহকর্মী চৌধুরী ভাবীর শরণাপন্ন হলাম। ভাবী নাশতা রেখে চলে গেলেন।

তোমাকে একটা জরুরি কথা বলবো বলে ডেকেছি। বন্যা শুরু করলো। তুমি আমাদের সিনিয়র *নঈম* ভাইকে চিনতে?

হ্যা। সহপাঠি লিটনের বন্ধু। ধনীর দুলাল সে। শুনেছি তার পেছনে মেয়েদের লাইন লেগে থাকতো।

সে যাই হোক। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছিল। মনে-প্রাণে চাইতাম তাকে।

হলো না কেন?

উত্তরে বলেছো, পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা হবে না বলে নঈম পিছু হটেছে। ভালোবাসা অর্থের কাছে হেরে গেছে।

আমাকে দুর্বল পেয়ে কুপোকাত করে এই কথা! বিড় বিড় করলাম। বর্তমানের কথা বলো।

আমি তোমাকে প্রস্তাব করেছি, তুমি নও।

চৌধুরী ইতি টানলেন। আড়ালে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কিছুই করেননি।

ভাবী কি যে বলেন, বলে রাস্তায় পা বাড়ালাম। ভাবীর কথায় মেয়ে চরিত্রের চারদিক চিন্তা নিয়ে ডরমেটরিতে ফিরলাম।

বন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। সময় কেমন যেন ঝরঝরে লাগছিল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই বন্যাকে কেন যেন অন্যমনস্ক মনে হতে লাগলো।

কোনো এক নীরব রাতে বন্যাকে বললাম, বন্যা, কিছু কি লুকাচ্ছ? কোনো ভনিতা নয়। তোমাকে অন্যমনস্ক দেখায়, যেটা হয়তো তুমি বোঝ না। আমার কাছে লুকানোর কিছুই নেই। আমরা এখন স্বামী-স্ত্রী।

তুমি ঠিকই ধরেছো। তোমাকে বলবো, বলা দরকার, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না।

এটা তোমার দুর্বলতা। এখন বলো নিঃসংকোচে।

এখানে জয়েন করার পর ছুটিতে এমএড পরীক্ষা দিতে ঢাকা চলে যাই। প্রায় দুই মাসের এ ছুটিতে সহপাঠি রাসেল তার রুমমেটের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। পাত্র দেখে পছন্দ না হলে রাসেলকে একদিন বলি, আপনার পছন্দের কিভাবে তারিফ করবো বলুন তো?

কেন বন্যা? কি হয়েছে?

অন্যকে এতো ছোট করে দেখার কোনো কারণ থাকতে পারে?

আসলে বন্যা, ওভাবে আমি ভাবিনি। তিনি মেয়ে খুজছিলেন আর আপনাকে পছন্দ হয়েছে বলেই প্রস্তাব করেছি। ভুল করে থাকলে মাফ করবেন।

অন্তত আপনার মতো হলেও না হয় ভাবা যেতো।

বন্যা, আমি এটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম অনেকদিন। সাহস হচ্ছিল না।

সেটা কি?

বন্যা, আপনার জন্য আমি সবকিছু উজাড় করে দিতে পারি?

এটা কি বলছেন আপনি?

হ্যা, বন্যা তোমাকে ভালোবাসি।

আমার সহজ অভিব্যক্তি কাল হলো। ধরা পড়ে গেলাম। রাসেলের পীড়াপীড়িতে আমি পরাজিত হলাম। ক্লোজ হলাম এবং মিশলাম। বুঝছিলাম, রাসেল আমার দেহে আকর্ষণ খুজছিল বেশি। সরে আসতেও পারছিলাম না। প্রথমত কোর্স শেষ করা। তীরে এসে তরী ডোবাই কি করে। ছুটিও নিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে কথা বলার পর, সবকিছু জানার পর আমার মোহ ভাঙতে শুরু করে। আমি নিস্তার চাইলাম। যে কারণে তোমাকে সরাসরি প্রস্তাব করলাম লজ্জার মাথা খেয়ে। রাসেল সামনে এসে দাড়াতে পারে শংকায় আমার প্রতিটা মুহূর্ত কঠিন লাগছিল। তোমার মনের অনুভূতি কি হবে আমি জানি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো।

সে রাত আমার ভালো কাটেনি। কয়েকদিন ছটফট করে কাটিয়েছি। তবে বন্যাকে বুঝতে দিইনি। নিজের পেছন ফিরে চাইলাম। সহজ হলাম। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই আছি। বন্যাকে ভালোবাসি এবং সেও আমাকে ভালোবাসে। আমি ফাদ খুজি না। সন্তানরা বন্ধন গাঢ় করেছে আরো।

তারাকান্দি, জামালপুর থেকে

মুসকান

শুধু একবার চোখে চোখ রেখে বলো

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তাহলে আমি ক্যাটরিনা ঝড় থামিয়ে দেবো।

ইরাক যুদ্ধের জন্য বুশের কলার চেপে ধরবো।

শোয়েব আকতারের বলে সিক্স মারবো কিংবা রোনালডোর পা থকে বল কেড়ে নিতে পারবো।

সূর্যের মাঝে কতো রহস্য আছে, কাছে গিয়ে সেটাও জেনে আসবো।

শুধু একবার বলো ভালোবাসি, ব-ল-বে?

বান্দর অ্যান্ড বিটল

মধুমালতী

–মোহাম্মদ নওসাদ আলী

বিশ বছর আগে খান বাড়ির জামাই হয়েছেন গোলাম মোস্তফা। জামালপুর শহরে আভিজাত্যের দাবিদার এই খান বাড়ি। খান বাড়ির ছেলেরা সেই বৃটিশ আমল থেকেই জজ, ব্যারিস্টার হয়ে আসছেন। এখনো একজন সরকারি দলের মন্ত্রী তো অপর ভ্রাতা বিরোধী দলের ত্রাতা সেজে বসে আছেন।

এই পরিবারের খান মোহাম্মদ আশিকুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মধুবালাকে বিয়ে করেছেন পাশের মহল্লার ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা।

না, ইয়ে করে বিয়ে নয়। খানদের মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেয়াই পাপ, সেখানে ভালোবাসা করে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

মেধাবী ছাত্র শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকরিতে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদলাভ করে তবেই মধুবালাকে বধূ হিসেবে পেয়েছেন। ছাত্র অবস্থায় মধুবালাকে শুধু কল্পনায় এনে অসম্ভবের পশ্চাতে ছুটতে চাননি বলেই হয়তো তার বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের কাছে পান্তা ভাতে পরিণত হয়ে সে সুন্দরী যুবতী মধুনির্ঝর বধূতে পরিণত হয়েছে।

গোলাম মোস্তফার একমাত্র শ্যালিকা মধুমালতী কয়েক বছর ধরে বিয়ের যোগ্য হয়েছে। যেমনি সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। স্মার্ট তো বটেই। সিনেমার নায়ক, আকাশ চ্যানেলের তরুণ গায়ক, ডাক্তার,

ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর কাউকেই পছন্দ নয় তার। বিল ক্লিনটনের সুন্দর মার্জিত চেহারাকে *লুচ্চা* বলে বিদ্রূপ করে সে। গোলাম মোস্তফা ধমক দিয়ে বলেন, আঃ! হচ্ছেটা কি? সম্মানিত ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করতে নেই।

আমি প্রমাণিত সত্যের ওপর ভিত্তি করে কথা বলি দুলাভাই।

তুমি কি নিজেকে মোনালিসা নাকি ঐশ্বরিয়া রায় ভাবো? কোনো ছেলেকেই তোমার পছন্দ নয়!

মোনালিসা মোটেও সুন্দরী নয়। আর ঐশ্বরিয়া রায়কে টপকিয়ে বলিউডে এখন একাধিক নায়িকা সদম্ভে বিচরণ করছেন। সৌন্দর্য বিষয়টি আপেক্ষিক ব্যাপার। হতে পারে আমি যার চোখে সুন্দরী, ঐশ্বরিয়া রায় তার কাছে বিন্দুও নয়, অথচ আমি মহা সিন্ধু।

কে সে ভাগ্যবান? সে সুন্দর শশধর নভো নীলিমায় কেন উদিত হচ্ছে না?

মধুমালতীদের চার ফুপু। বড় তিন ফুপুর বিয়ে হয়েছে দেশের নামকরা সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ছোট ফুপু মাহিনুর বানু পালিয়ে বিয়ে করে এক গরিব স্কুল মাস্টারকে। সেই থেকে মাহিনুর বানু দীর্ঘ ত্রিশ বছরে আর খান বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। এ বাড়ির ছোট-বড় যে কেউ কোনো কারণে তার প্রসঙ্গ এসে পড়লে ঘৃণায় মুখ বাকা করে।

এ বাড়ির কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানেও মাহিনুর কিংবা তার স্বামী-সন্তানদের কখনো ডাকা হয় না। এমন কি তার বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর লাশ পর্যন্ত দেখতে দেননি তার ভাইয়েরা। বাবা-মায়েরও নাকি অন্তিম ইচ্ছা ছিল, তাদের মরা মুখও যেন দেখতে না দেয়া হয় সেই অধঃপতিত কন্যাকে।

মধুমালতীর মুখেই তার ছোট ফুপু সম্পর্কে সব কিছু জেনেছেন গোলাম মোস্তফা। শ্যালিকা ঘৃণার সঙ্গে অধঃপতিত ফুপুর ঘটনা বয়ান করতো দুলাভাইয়ের কাছে।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। গোলাম মোস্তফা শহরের অভিজাত বিপণিতে স্ত্রী ও শ্যালিকাসহ কেনাকাটা করছেন। হঠাৎ বোরকা পরা এক মহিলা এসে তার হাত চেপে ধরে।

বাবা! সম্পর্কে তুমি আমার জামাই হও। আমি তোমার ছোট ফুপু শাশুড়ি। আমার মেয়ের আগামীকাল বিয়ে। আমি তো ও বাড়িতে ঢুকতে পারি না। তোমরা ছাড়া আমার কে আছে বলো? মধুবালা, মধুমালতী যদি আসে খুবই ভালো। শুনেছি, তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছেলে। আমার মেয়ের বিয়েতে তোমাকে আসতেই হবে।

জননীর মতো চেহারা। অশ্রুসজল দৃষ্টিতে আকুল মিনতি ঝরে পড়ছে। তার কি সাধ্য তা অগ্রাহ্য করে? নিজের অজান্তেই মোস্তফা বললেন, আসবো ফুপু। অবশ্যই আসবো।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তোমার ভালো করুন। মধুবালা মধুমালতী, তোমরা যদি আমায় ক্ষমা করে থাকো – আসবে কিন্তু।

মধুমালতী সক্রোধে উত্তর দিল, বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছো তুমি। খান বংশের কেউ তোমার মেয়ের বিয়েতে যাবে, আশা করো কি করে? দুলাভাই খান বংশের কেউ নয়, সে যেতে পারে। আমরা যে যাবো না, তা মুখের ওপরেই বলে দিলাম।

এবার একটি ছেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। বললো, থুথু দিই তোমাদের খান বংশের অহমিকায়। লুটের টাকা, বুটের ঘা, ঠোটের লিপস্টিক ছাড়া কি আছে ওই খান বংশে? ছেলেটি সত্যিই একরাশ থুথু ছড়িয়ে দিল মধুমালতীর মুখ জুড়ে। তারপর ছোট ফুপুর হাত ধরে টেনে জোরে সে চলে গেল।

ওড়না দিয়ে থুথু মুছতে মুছতে মধুমালতী বললো, ছোটলোকের বাচ্চা। তোকে যদি তোর বাপের নাম না ভোলাই তো আমি খান বংশের মেয়ে নই, আমার নাম মধুমালতী নয়।

ছেলেটা ছোট ফুপুর পুত্রধন। রাগে ফুসছে গোলাম মোস্তফার স্ত্রী।

মধুবালা বললো, মায়ের অপমান কে সহ্য করতে পারে বলো? স্বামীর সহানুভূতিশীলতা উপলব্ধি করে মধুবালা আরো বললো, অবশ্য ছোট ফুপুর মুখের ওপর কটূ কথা বলা মধুমালতীর উচিত হয়নি।

মধুমালতী ফোস করে উঠে বললো, অতো ভড়ংয়ের ধার ধারি না। যা সত্য তা সোজাসুজি বলে ফেলি। যাদের সম্পর্ক অগ্রাহ্য করে সে পরপুরুষের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, সে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেয়ার এতো আগ্রহ কেন?

মোস্তফা বললেন, কারো প্রতি অতো কঠোর হতে নেই মালতী। সব ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। তিনি তো পরপুরুষকে বর করে ঘরে উঠেছেন। সে ঘরকে তো আর পর করেননি। তিনি তো পরাজিত হয়ে তোমাদের আশ্রিতা হননি।

পরের দিন মধুবালাকে সঙ্গে নিয়ে গোলাম মোস্তফা ছোট ফুপুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রওনা দেয়ার ক্ষণে মধুমালতী চিৎকার করে বাড়িশুদ্ধ লোকদের হতবাক করে ফেললো।

শ্বশুর মারা গেছেন বলে কি তার সম্মানটা পর্যন্ত জামাই হিসেবে আপনি রাখতে চাচ্ছেন না। কুলত্যাগী ফুপুকে আমাদের পিতৃপুরুষদের কেউই সহ্য করেননি, এ বাড়িতে কখনো গ্রহণ করেননি, আত্মীয় বলে স্বীকার করেননি, কোনো বিপদে-আপদে কখনো তার সংবাদটি পর্যন্ত দেননি। এমন কি যাকে তাদের মৃত মুখ পর্যন্ত দেখতে দেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গেছেন, সে বাড়ির জামাই হিসেবে আপনি এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করতে পারেন না। আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি। নিজে যাচ্ছেন, সঙ্গে আপাকেও নিয়ে যাচ্ছেন। বলিহারি আপা। বাপ-দাদাদের প্রতি এই তোমার সম্মানবোধ! পতিদেবতার কথায় সব দফা রফা হয়ে গেল?

মধুমালতীর এ অহেতুক শ্লেষ মিশ্রিত আর্তনাদের জবাব দেয়া আর বহ্নিপ্রলয়ে ঘৃতাহুতি দেয়া সমান ভেবে মোস্তফা দম্পতি নিমন্ত্রণ রক্ষার ইচ্ছা থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করলেন। তাদের কৌতূহলের উদ্রেক হলো, মধুমালতী আকস্মিক এতো নির্দয় পাশবিক হলো কেন? কপোলে থুথুর ভূত ঘাড়ে চেপে বসেছে নিশ্চয়। প্রবীণদের দায়দায়িত্ব নিজের কাধে চেপে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাফিয়ে ওঠা এক ধরনের প্রগলভতা। এই প্রগলভতা সহ্য করাও অসহ্য বটে।

একমাত্র শ্যালিকা মধুমালতীর এ অপ্রত্যাশিত আচরণ অসহ্য বোধ হলেও সে মুহূর্তে নীরব থেকে পরিবেশ সহনশীল রাখাই উত্তম হবে ভেবে মোস্তফা কিছু বললেন না এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছাও ছাড়লেন।

দেমাগী মধুমালতীর বিয়ের প্রস্তাব আসে।

ঘর ভালো তো বর ভালো নয়। বর ভালো তো বংশ পরিচয় নগণ্য। কন্যার বাবা-মায়ের পছন্দ হলেও কন্যা একেবারে না বলে বসে।

এভাবে একদিন ছোট কন্যা মধুমালতীকে পাত্রস্থ না করেই খান মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ইন্তেকাল করলেন। শ্যালিকার বর জোটানোর দায়িত্ব এসে পড়লো গোলাম মোস্তফার ঘাড়ে। তিনি একদিন সহকর্মীর অনুজ গণপূর্ত বিভাগে সদ্য চাকরিপ্রাপ্ত এক স্মার্ট ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে খান বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সিনেমার হিরোকে হার মানানো পাত্র। এবার না বললে আর মানা যায় না।

কিন্তু সেদিন রাতেই উধাও হলো মধুমালতী। পরদিন খোজ নিয়ে জানা গেল, ছোট ফুপুর সেই বেকার পুত্রধন, ঠেলেঠুলে থার্ড ডিভিশনে বিএ পাস করা ছেলেটির হাত ধরে বৌ হতে রাজি হয়ে কাজী অফিসে গিয়ে সব হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ফেলেছে মধুমালতী।

প্রাপ্তবয়স্কার মন রোধ করে সে সাধ্য কার?

এ অবিশ্বাস্য ও আকস্মিক ঘটনায় গোলাম মোস্তফার মনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হলেও মধুমালতীর কাছ থেকে উত্তর পাওয়া আর কোনোদিনই সম্ভব নয়। কেননা ছোট ফুপুর মতোই খান বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া নারী আর কোনোদিনই এ বাড়িতে ঢুকতে পারে না।

রাজশাহী থেকে

ছুয়ে ছুয়ে যায়

–কামরুজ্জামান বাবু

২০০২।

বই প্রকাশনার কাজে এক সপ্তাহের জন্য নাইট কোচে ঢাকায় রওনা দেবো। বৌ বায়না ধরলো সঙ্গে যাবে। কিন্তু আমার কাজের অসুবিধা হবে ভেবে তাকে নিতে রাজি নই। অবশেষে মনোমালিন্যের মধ্যে তাকে রেখে একাই রওনা হলাম। এক সপ্তাহের কাজ বৌয়ের কারণে তড়িঘড়ি তিন দিনে সেরে ফেললাম। ঢাকায় দেরি না করে আবার নাইট কোচে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

বাড়ি ফিরে শুনি বৌ তার বাবার বাড়ি চলে গেছে। মনটা খারাপ করে বাড়ির বাইরে বের হলাম। পথে বন্ধু মাসুদ বললো, তোর নামে নারী নির্যাতন কেস হয়েছে। তার কথা শুনে আমি হতভম্ব। বন্ধু আমার হতবিহ্বল ভাব দেখে বললো, ইয়ার্কি নয়, সিরিয়াসলি বলছি। ভাবী কেস করেছে। খোজখবর নে।

আমি তার কথায় মোটেও আমল দিইনি। তবু শ্বশুর বাড়ি রওনা দিলাম। বাড়ি গিয়ে দেখি দৃশ্যপট উল্টো। আমাকে দেখে বৌ দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকলো। শাশুড়ি, শ্যালক–শ্যালিকা সবাই বিমুখ। আমার মনে হালকা সন্দেহ হলো। মুখে সবার কুলুপ। কেউ মুখ খুলছে না। অপরাধীর মতো মন খারাপ করে অসহায় হয়ে দাড়িয়ে আছি। অবশেষে শাশুড়ি মুখ খুললেন। তিনি আমাকে সাফ জানিয়ে দিলেন, তুমি বাবা বাড়ি যাও। কোর্টে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

কোর্ট! এ কি কথা বলছেন আম্মা! শাশুড়ি আম্মা আমার এমন জবাবের উত্তর দিলেন, ন্যাকামো করার জায়গা পাচ্ছো না, টের পাবে। গোষ্ঠিসহ গেথে দিয়েছি। এখন যাও সামাল দাও গিয়ে। তারপরও শাশুড়ি আম্মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো। কিন্তু ফল হলো না। অবশেষে আদালত পাড়ায় খোজখবর নিয়ে জানলাম পুরো পরিবার আমরা নারী নির্যাতন কেসের আসামি। এমনকি নাবালক ভাই ও বিবাহিত বোনসহ।

ধন্যবাদ প্রিয়তম বৌ আমার। তোমার দয়ায় গোষ্ঠিসহ আমরা প্রথমবারের মতো আসামির কাঠগড়ায় দাড়াবো। এই তোমার শ্রদ্ধাবোধ, এই তোমার ভদ্রতা? কিন্তু কাঠগড়ায় ওঠার আগে মান গেল, জাত গেল, প্রশ্নবিদ্ধ হলো জীবন। তাই পুনরায় আমার গুণবতী স্ত্রীর শরণাপন্ন হলাম।

তিনি স্রেফ জানিয়ে দিলেন, মাত্র চার লাখ টাকা। তবে মানুষ জানবে এক লাখ টাকা দিয়ে মীমাংসা হলো।

টাকার প্রবল চাপটা সামাল দেয়া আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বাড়ি এসে সবাইকে অবগত করলাম। হঠাৎ করে এতো টাকা? তা না হলে পুলিশের প্যাদানি, কোর্টের হাকাহাকি, অবশেষে হাজতের ঘানি। এমন চিন্তা শেষ না হতেই দেখি ছোট বোন তার গা থেকে একে একে গয়নাগুলো খুলে যাচ্ছে। বড় বোন দৌড়ে তার বাড়ি গেল, মেজ বোনও তেমন। ওরা যেন চিলের চেয়েও গতিসম্পন্ন হয়ে মুহূর্তে ফিরে এলো। শুধু আমাকে বাচাতে। তাদের এক মুঠোতে টাকা, অন্য মুঠোতে তাদের ও তাদের প্রিয় সন্তানদের ব্যবহৃত গয়না। উজাড় করে মুক্তহস্তে আমাকে দিল।

নে, দেখ। কতো কি হলো। আর কতো লাগবে।

বৃদ্ধ মায়ের অশ্রুসিক্ত চোখ, বেরিয়ে এলো বাবার গচ্ছিত পেনশনের টাকা। ওটাই মায়ের শেষ সম্বল। শুধু আমাকে বাচানোর জন্য। অঘোষিত না – দাবিতে দিয়ে দিলেন। আমাকে বাচাতে আমার চাচা, চাচাতো ভাই, ফুপা, ফুপু, মামা, মামাতো ভাই, বন্ধু, পাড়া–পড়শি সবার সহযোগিতা এতোই নিঃস্বার্থ ছিল যে পৃথিবীর সকল প্রকার ভালোবাসা তাদের কাছে হার মানবে। এখন আমি মাঝে মধ্যে সেই দুর্দিনের কথা মনে করি। মনের অজান্তে চোখের কোণে জল এসে যায়। আমার পরিজনরা এতোটাই আমাকে ভালোবাসে! এতো নির্মল ভালোবাসা! এর ঋণ কি করে শোধ করবো?

নামোশংকর বাটী, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে